নেতাজী সুভাষচন্দ্র
ও
আমাদের ইতি কর্তব্য

লেখক— শ্রী তারাপ্রসাদ গুপ্ত।

Netaji Subhas Chandra - O - Amader Iteekartavya :
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আমাদের ইতিকর্তব্য ।

প্রকাশিত ঃ ১৯.০৮.২০০০

লেখক ঃ শ্রী তারাপ্রসাদ গুপ্ত
ব্লক - ৮, ২য় তলা, এফ-৪
পোদ্দার পার্ক সরকারী আবাস
কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫

প্রকাশক ঃ ভাগ্না - ভাগ্নী

ডি. টি. পি. ঃ প্রিন্ট-ও-গ্রাফ্
৬৭/বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা - ৭০০ ০১২
দূরভাষ - ২৩৭-৫০৪৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ অমরনাথ আঢ্য

মুদ্রক ঃ ডট্-ও-প্রিন্ট
৮, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা - ৭০০ ০১২.
দূরভাষ - ২৩৭-৮৯৪৭

ভূমিকা

আনিলাম অপরচিতের নাম ধরণীতে
পরিচিত জনতার সরণীতে।

অপরিচিতের পরিচয় যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্রমুখি
মেঘের কার্পন্য টুটি
সংগোপনে বর্ষন সঞ্চয়
ছিন্ন করে, মুক্ত করে সর্ব জগন্ময়।

অনেক অজ্ঞাত অধ্যায়, অনেক স্বীকৃতিহীন বীর যোদ্ধা ছিলেন। যাঁদের মূল্য দেওয়া হয়নি, মূল্যের জন্য তাঁরা আসেন নি। তাঁরা এসেছিলেন এক মহান ব্রত পালন করার জন্য, কিছু মানবিকতার দৃশ্যপটে আত্ম পরিচয় লাভ করার জন্য। নিঃশব্দের উপত্যকা দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন ক্ষত চিহ্নের গৌরব নিয়ে পৃথিবী তাঁদের দিয়েছে বিদ্যুতের ক্ষুধিত ঝলক আর রিক্তবর্ণ স্মৃতির আকাশ।

'অন্ধকারের বিদগ্ধ নগরে' এমনই এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমরন বিপ্লবী শ্রী তারাপ্রসাদ গপ্ত, সংগ্রাম এই মানবের জন্ম ১৯১৩ সালের ৫শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন পূর্ববাংলায় তারাপ্রসাদ গুপ্তের পারিবারিক সুখ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর বাবা ৺নারায়ণ গুপ্ত বরিশাল জেলায় (আদি উক্ত জেলার শিকারপুর) এক বিদগ্ধ কবিরাজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পূজার্চনা করতেন। একাধারে ধর্ম ছিল তাঁর বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সমাজকল্যাণের তিনি বরিশাল জেলার "ধর্মরক্ষনি সভার" আজীবন সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন এবং পাশাপাশি বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শিকারপুরের তারপীঠ ৫২ পীঠের একটি, ১৯১২ সালের কোনো এক সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু ধর্মান্ধ ব্যাক্তি এই পীঠকে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ করে ৺নারায়ণ গুপ্ত নিজ প্রচেষ্টায় এই পীঠের সংস্কার সাধন করেন। সাত কন্যার পর যখন ১৯১৩ সালে একমাত্র পুত্রের জন্ম হয়, তখন সংস্কারবশতঃ উক্ত পীঠের নামানুসারে পুত্রের নাম রাখেন তারাপ্রসাদ।

তারাপ্রসাদ গুপ্ত বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সময় মাতৃভূমির সেই মুক্তি আহ্বানে অনুশীলন দলে যোগদান করেন। তাঁর রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক ছিলেন গোপাল মুখার্জ্জী, দেবেন

বই বইয়ের ঠিকানা

ঘোষ, যতীন রায়, প্রমুখ বিপ্লবী। তিনি প্রথম ১৯৩০ সালে আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে অস্ত্রলুণ্ঠন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। যদিও প্রামান্যের অপ্রতুলতায় তিনি ছ'মাস পরে মুক্ত হন। এর পর ১৯৩২ সালে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন এবারও তিনি প্রমানাভাবে মুক্ত হন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স আইনে' কারারুদ্ধ থাকেন এবং কারামুক্ত হওয়ার পরেই তিনি বরিশাল জেলা থেকে বিতাড়িত হন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিপ্লবের এক দেশদ্রোহী সংগ্রামী হিসেবে। একদিকে বিবেকানন্দ ও অন্যদিকে নেতাজীর নিঃশঙ্ক বাণী তারাপ্রসাদ গুপ্তর জীবনে ছিল অঙ্গীভূত। তিনি জানতেন মানবের মধ্যে যা কিছু মহৎ, যা কিছু অমোঘ ও সম্ভাবনা তাই জীবন। তাই তিনি হৃদয় ও মনে বিশ্বাস করতেন স্বামীজীর সেই অমোঘ বাণী—"Get up, and set your shoulder to the wheel-howlong is this life for? As you have come in to this world, leave some work behind." তিনি ১৯৪০ সালে নেতাজীর আহ্বানে সিরাজদৌল্লা দিবসে (৩রা জুলাই) মনুমেন্ট অপসারনে নিজেকে বীর মানবের মতই সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি আজীবন অকৃতদার। তিনি মরনোত্তর দেহ ও চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেছেন।

বহুশ্রুত তথা অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর অনুসৃত পথের পথিক থেকে তিনি নিজেকে এক অখ্যাত মেরুতে স্থাপন করেছেন। অভাব অনটন থাকা সত্বেও তিনি ভারত সরকার দ্বারা প্রদেয় একমাত্র তাম্রফলক ছাড়া অন্য সবকিছুকেই এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাতা পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করে এক বিশাল মহীরুহের মত সতত নির্লিপ্ত আছেন।

মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু মৃত্যুও তার কীর্তি কে ম্লান করতে পারবেনা। অগণিত, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম তথা আন্দোলনের মধ্যে তিনি আছেন এবং থাকবেন। কবির ভাষায় বলা যায়—

"জেনো হে মানুষ, সব স্বপ্নেরই রূপ আছে
গড়া যায় মাটি ও পাথরে
যদি কোনো প্রতিজ্ঞার ভয়হীন দীপ্তি থাকে প্রাণে"

৩৬ জন ভাগ্নে ও ভাগ্নীর সৌজন্যে এই বই প্রকাশিত হল। তাই আমরা বিনম্র চিত্তে বলি—"বিবেকের এই দিব্যাধিভূতি, লহো, আমাদের প্রণাম।"

সুভাষ-পরিচিতি

১. ১৮৯৭ সন, ২৩শে জানুয়ারী, কটকের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহন করেন। পিতা জানকীনাথ ছিলেন কটকের একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। সুভাষচন্দ্রের শৈশব ও বাল্যজীবন আর পাঁচটি সাধারণ ছেলের মতই কাটিয়া যায়। কৈশোর জীবন থেকেই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সমাজ ও আর্তসেবার একটা মানষিকতা লক্ষ্য করা যায়। কটকের স্কুল জীবনের শিক্ষক, বেনীমাধব দাসের শিক্ষা এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে যথেষ্ট প্রেরনা যোগায়। কটকের স্কুল জীবন শেষ করিয়া সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কলেজ অধ্যাপক ওটেন সাহেব ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটা অশ্লীল মন্তব্য করায় 'ওটেন সাহেব', সুভাষচন্দ্র কর্তৃক লাঞ্ছিত হন। এ কারণে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দুই বছরের জন্য সুভাষচন্দ্রের পড়াশুনা বন্ধ হইয়া যায়। পরে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সহায়তায় সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং কৃতিত্তের সাথে কলেজের পড়া শেষ করিয়া, পিতা জানকীনাথের নির্দেশে আই.সি.এস. পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ড যান। ১৯২০ সনে, সুভাষচন্দ্র আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সনে সুভাষচন্দ্রের জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তিনি আই.সি.এস. থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতে ফিরিয়া আসেন। দেশে তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রবল বেগে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল। দেশে ফিরিয়া আসিয়াই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং গান্ধীজীর পরামর্শে বাংলায় আসিয়া দেশবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলনে জড়াইয়া পরেন এবং বন্দী হন।

২. ১৯২৪ সনে মুক্ত হইয়া আসিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন এবং সুভাষচন্দ্রকে করপোরেশনের প্রধান প্রশাসক পদে নিযুক্ত করেন। করপোরেশনের প্রধান প্রশাসক থাকা কালেই ১৯২৪ সনে সুভাষচন্দ্র আবার বন্দী হন। ১৯২৫ সনে দেশবন্ধু মারা যান। সুভাষচন্দ্র তখন বার্মার মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯২১ সন থেকে ১৯২৭ সন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বার্মা সহ ভারতের বিভিন্ন জেলে বহুদিন আটক ছিলেন। মুক্তি পাইয়া আসিয়া সুভাষচন্দ্র আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯২৮ সনে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং ঐ অধিবেশনেই ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু গান্ধীজীর বিরোধীতায় প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া যায়। পরের বছর ১৯২৯ সনে লাহোর কংগ্রেসে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তখন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত প্রতি বছরই ১৬শে জানুয়ারী দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করা হইতে থাকে।

বই বইয়ের ঠিকানা

১৯৩০ সনে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩১ সনের ১৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া সুভাষচন্দ্র পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন এবং বন্দী হন। ১৯৩১ সন থেকে ১৯৩৭ সন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র অধিকাংশ সময়েই বন্দী ছিলেন বা চিকিৎসার কারণে ইউরোপে ছিলেন। ইউরোপে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র তাঁহার 'ভারতের সংগ্রাম' (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগেল), পুস্তকখানার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করেন। ১৯৩৮ সনে সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) নির্বাচিত হন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহন করেন। ১৯৩৮ সন থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের জীবন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে দুরন্ত গতিতে আগাইয়া যায় এবং বিশ্বের সর্বকালের সর্বদেশের এক অনন্য বিপ্লবী শ্রেষ্ঠের আসনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এখন আমরা সেই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে সুভাষচন্দ্রের অবদান এবং স্বাধীন ভারত গঠনে তাঁহার পরিকল্পনাটিও তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

প্রস্তাবনা ঃ—

৩. দেশ আজ এক দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন। রাজনৈতিক নেতারা আত্মকলহ ও পরস্পর কাদা ছোড়াছোড়িতে মত্ত। জাতি বিভ্রান্ত হতাশাগ্রস্ত। সে আজ পথের সন্ধান চায়। কে আজ জাতিকে এই বিভ্রান্তি, হতাশা ও সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে? নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার জীবন দর্শনই জাতিকে এই বিভ্রান্তি, হতাশা ও সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে। এখন আমরা সেই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

৪. আমরা তিনটি পর্যায়ে আমাদের আলোচনাটি শেষ করিব। প্রথম পর্যায়ে থাকিবে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ ও সুভাষচন্দ্র, এবং সেই ঐতিহাসিক দিনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জাতীয় নেতৃত্বের বিরোধ এবং তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্বের এবং বামপন্থী ও বিপ্লবী দলগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু তথ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকিবে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক মতামতগুলি সম্বন্ধে একটি আলোচনা। তৃতীয় পর্যায়ে থাকিবে সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন ও স্বাধীন ভারত গঠনে তাঁহার পরিকল্পনা।

৫. প্রতি দেশেই মহান ব্যক্তিদের স্মরণ করা হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য কি তাঁহারা দিয়াছেন, কি আমরা পাইয়াছি এবং কি আমরা পাইতে পারি, সেই সব মহান ব্যক্তিদের জীবন বাণী হইতে তাহারই পর্যালোচনা করা। আমরা এই মূল লক্ষ্যটির কথা ভুলিয়া গিয়া বৎসরান্তে একবার করিয়া ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের পূজা দিয়াই আমাদের কর্তব্য শেষ করি। তাই এই মহান সাধকের স্মরণ দিবস আজ শুধু অনুষ্ঠানেই পরিণত হইয়া এই দিনটির

গুরুত্ব ও জনমনে তাহার প্রভাব ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। আজ দিন আসিয়াছে যখন নূতন করিয়া সুভাষজীবনের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

৬. সুভাষচন্দ্র এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি আছেন কি নেই আমরা জানিনা! কিন্তু আমরা জানি তাঁহার জীবনাদর্শ চিরজীবী। অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার আপোসহীন সংগ্রামের আহ্বান যুগ যুগ ধরিয়া অত্যাচারিত লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানুষকে প্রেরনা যোগাইবে। তিনি বলেন "এই নশ্বর জগতে সব কিছুই ধ্বংস হয়। হয় না শুধু ভাবধারা, আদর্শ ও স্বপ্ন। আদর্শের জন্য ব্যক্তি জীবন বিসর্জন দিতে পারে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই আদর্শ সহস্রের জীবনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এমনি করেই এক যুগের ভাবধারা, আদর্শ ও স্বপ্ন পরবর্তী যুগে বাস্তব মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠে।" "শহীদের তাজা রক্তেই গোড়াপত্তন হয় যত জাতীয় তীর্থের" দিনের বানী (নেতাজীর বানী পৃষ্ঠা ১৫ ক্রস রোডস পৃঃ ৩৪২ প্রেসিডেন্সী জেল থেকে ১৬.১১.৪০ সনে গভর্নরকে দেওয়া চিঠির অংশ)। সুভাষচন্দ্রকে লইয়া স্বদেশে ও বিদেশে বহু আলোচনা হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবেও। আমরা তাঁহাকে যেমন ভাবে বুঝিয়াছি, তাঁহার জীবনদর্শনের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার যে ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছি আমরা শুধু তাহারই পর্যালোচনা এখানে করিব। প্রথমে আমরা তাঁহার প্রাক স্বাধীনতা যুগের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ বিরাট কর্মবহুল জীবন স্পর্শ করিয়া ভবিষ্যৎ পথের সন্ধান করিব।

৭. প্রথম অধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় ও সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্রকে আমরা শেষ দেখিয়াছি পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত আপোষহীন এক দুর্ধষ সৈনিক রূপে। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এই মহাবাক্যকে বীজমন্ত্র করিয়া সুভাষচন্দ্র আগাইয়া চলিলেন এক স্থির লক্ষ্যে, সামনের দিকে। লক্ষ্য 'সমস্ত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।' সুভাষচন্দ্র বলেন— তারা বলে আমি স্বপ্ন দেখি, আমি স্বাপ্নিক। আমি স্বীকার করি আমি স্বাপ্নিক। আমার সকল স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন 'আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্বপ্ন ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্ন' (সুভাষচন্দ্র দিনের বানী)।

৮. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছিল পাশাপাশি দুইটি পৃথক ধারায়। একটি গোপন পথে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়া ইংরেজদের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়া। অপরটি হইল গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পরিচালিত অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করিয়া আপোষের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে স্বাধীনতা লাভ। যদিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছিল দুইটি পৃথক ধারায়, কিন্তু ধারা দুইটি পৃথক হইলেও উভয়ে ছিল উভয়ের পরিপূরক।

৯. রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রধানত একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী। লক্ষ্য পূর্বেই বলিয়াছি 'সমস্ত ভারতের পূর্ন স্বাধীনতা'। পথ-গান্ধীজীর

বই বইয়ের ঠিকানা

প্রবর্তিত অহিংস প্রতিরোধ ও অসহযোগিতা। লক্ষ্য অবশ্য তাঁহার ঠিকই ছিল, কিন্তু পথ সম্বন্ধে তাঁহার কোন স্পর্শকাতরতা ছিল না। গোপন পথে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়া ক্ষমতা দখল ও স্বাধীনতা অর্জন, তাঁহার স্বপ্ন জগতের বাহিরে ছিল না। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁহার গোপন যোগাযোগই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি বলেন, "আমার রাজনৈতিক জীবনে এই সত্য আমি বারবার অনুভব করেছি যে, ভারত প্রত্যেক বিষয়ে প্রতি ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা পাবার জন্য প্রস্তুত ও উপযুক্ত। কেবল একটি উপকরণের অভাব, জাতীয় মুক্তি সেনা ভারতের নেই। জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন কারণ তাঁহার অধীনে ছিল সৈন্যদল। গ্যারিবল্ডি ইতালীর মুক্তি সাধন সম্ভব করেছিলেন কারণ তাঁহার পেছনে ছিল সুসজ্জিত সশস্ত্র সেচ্ছাবাহিনী" (দিনের বানী)।

১০. ধীর পদক্ষেপে, ধাপে ধাপে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আগাইয়া চলিল। আগাইয়া চলিল সুভাষ জীবন। ১৯৩৮ সনে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন (তখন কংগ্রেস সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলা হইত)। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিরোধ দেখা দিল। আপোষহীন মুক্তিযোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ বাধিল আপোষধর্মী কংগ্রেস নেতৃত্বের। ঐ সময় প্রায় সকল বামপন্থী ও বিপ্লবীদলগুলি কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া কাজ করিত। কংগ্রেসের বাহিরে এই সব দলগুলি নিজ নিজ দলের কর্মসূচী অনুযায়ী চলিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া চাপ সৃষ্টি করিয়া, কংগ্রেসকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি মঞ্চরূপে ব্যবহার করিয়া, তাহাকে যতটা সম্ভব সংগ্রামমুখী করিয়া আগাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিত। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের এই যে বিরোধ, এই বিরোধ ছিল প্রকৃত পক্ষে ভারতের প্রগতিশীল সংগ্রামী চিন্তাধারার সঙ্গে সংগ্রাম বিমুখ আপোষকামী চিন্তাধারার বিরোধ। সুভাষচন্দ্র সেদিন ছিলেন আপোষহীন মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী আদর্শের মূর্তপ্রতীক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এই বিরোধের বিচার করিতে হইবে এবং তৎকালীন জাতীয় নেতত্বের এবং বামপন্থী ও বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপগুলি লক্ষ্য করিতে হইবে। সন ১৯৩৯, কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্কট ঘনীভূত। আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আপোষহীন মুক্তি যুদ্ধের সংগ্রামী জনতার মুখপাত্র রূপে প্রতিদ্বন্দিতার সিদ্ধান্ত নিলেন সুভাষচন্দ্র। সংগ্রামবিমুখ আপোষধর্মী কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁহাদের প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দিলেন ডাঃ পট্টভি সিতারামাকে। গান্ধীজী দিলেন তাঁহাকে আশীর্বাদ। সমস্ত প্রতিরোধের বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন সুভাষচন্দ্র। বিজয়ী হইল আপোষহীন মুক্তি যুদ্ধের সংগ্রামী আদর্শ।

১১. কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ নূতন রূপ নিল। ছলে বলে কৌশলে সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়িত করিবার জন্য দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব সমস্ত স্তরে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার

করিলেন। সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন ইউরোপে আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত। নূতন পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করিবার প্রস্তুতির জন্য সুভাষচন্দ্র জাতীয় নেতৃত্বের কাছে বার বার আবেদন জানাইতে লাগিলেন। জাতীয় নেতৃত্ব নীরব-অনড়। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের ভেতরের ও বাহিরের, বামপন্থীদের আহ্বান জানাইলেন ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি সংগ্রামী মোর্চা গঠন করিবার জন্য। বামমার্গী, বামপন্থার মুখোশধারীদের মুখোশ সেদিন খুলিয়া পড়িল। সংগ্রাম মুখর বাম ও অতিবামের দলগুলি প্রায় সকলেই নানা কৌশলে ও নানা অজুহাতে সুভাষচন্দ্রের সেই ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া না দিয়া, সেই সংগ্রামী মোর্চা হইতে দূরে সরিয়া থাকিল। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়, "একটি বামপন্থী সংস্থা গঠনের প্রস্তাব আলোচিত হয়।....আমি নিজে এবং আমার মত আরও কয়েকজন, যাঁরা তখনও কোন দলের সদস্যভুক্ত হইনি তারাও এই প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করি এবং এই বামপন্থী সংস্থার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাই।.....পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা এই প্রস্তাব ত্যাগ করেন। তাঁরা কেন এরূপ করলেন, তা আজ পর্যন্তও আমার নিকট পরিস্কার নয়। হয়ত তাঁদের মনে এরূপ ধারণা হয়েছিল যে, এরূপ বামপন্থী সংস্থা গঠিত হলে, তাঁদের নিজ নিজ দলের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে।" সুভাষচন্দ্র বলেন, "কেন সেই সমস্ত দলগুলি বামপন্থী কর্মসূচী অনুসরণে ব্যর্থ হল। বোধ হয় তারা সমাজতন্ত্রের প্রচারের জন্যই বেশী আগ্রহশীল ছিলেন, যাহা ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রধানত কর্তব্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরকে আরও সম্প্রসারিত করার সাথে সাথে তাকে শক্তিশালী করা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে আরও তীব্রতর করা।" তিনি আরও বলেন, "ভারতে এমন লোকও দেখতে পাই যাঁরা বামপন্থী বলে নিজেদের পরিচয় দেন এবং অনেক বড় বড় কথা বলেন, এমন কি সমাজবাদের কথাও বলেন, কিন্তু সংগ্রামের সময় তাকে এড়িয়ে চলেন এবং তার সমর্থনে নানাবিধ মুক্তির অবতারণা করেন। এমন ধরনের বাকসর্বস্ব সমাজবাদীর সন্ধানও পাই যাঁরা কাপুরুষতার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সাথে সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলেন (লোকমত-২৩.১.৬৩)। যাহাই হউক বামপন্থী দলগুলিকে লইয়া একটি সংগ্রামী মোর্চা গঠনের প্রচেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হয়।

১২. কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বেও বসিয়াছিলেন না। এই সুযোগে তাঁহারা নানা ঘৃণিত কৌশলে সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। একক সুভাষচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন সংগ্রামী জনতার মাঝে। কিছু কিছু বিপ্লবী ও সর্বভারতীয় নেতা তাঁহার সাথে আসিলেন। চেষ্টা শুরু হইল একটা সর্বভারতীয় দল গড়িবার।

১৩. দূরদর্শী সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল। ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাশিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুনীয়া ও ত্র্যাস্তোনীয়া দখল করিয়া পোল্যাণ্ডের উপর ঝাপাইয়া

বই বইয়ের ঠিকানা

পড়িল। মুহুর্মুহু ইউরোপের মানচিত্র বদলাইয়া যাইতে লাগিল। পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা হারাইল। জার্মানী পাল্টা আক্রমণে সম্মিলিত বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী পর্যুদস্ত। ফ্রান্স পদানত। বৃটিশ সেনা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া ফরাসী উপকূল ছাড়িয়া পালাইল স্বদেশে ইংলণ্ডে। পৃথিবীর সেরা সাম্রাজ্যবাদী দস্যু বৃটিশ হতমান তাহার সম্মান ভূলুণ্ঠিত। সুযোগ উপস্থিত। এইতো সময়। (শত্রু আহত, ক্লান্ত, পর্যুদস্ত। আর অপেক্ষা করা চলে না)। মুক্তিপাগল সুভাষচন্দ্র বার বার আবেদন জানাইতে লাগিলেন, জাতীয় নেতৃত্বের ও বামপন্থীদের কাছে। এই সময় সুভাষচন্দ্র তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলেন "প্রতিটি দিন যায় আর বসে বসে নিজের আঙ্গুল কামড়ান ছাড়া আর কোন গত্যান্তরও চোখে পড়ে না। যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। আজও কি ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার কোন পথই আমরা বেছে নেব না। অলস মন্থর অবসাদ কাটিয়ে ভারতবর্ষের শতকোটি দাস একবারের জন্যও কি উঠে দাড়াবে না? ভুলে যাবে না তাঁদের নিজেদের তুচ্ছ মতভেদ? এক জোট হয়ে তাঁদের মহান সনাতন মাতৃভূমির মুক্তিকল্পে রুখে দাড়াবে না?" (ফরোয়ার্ড ব্লক, তাং ১১.৫.৪০)। কিন্তু হায়, কার কাছে আবেদন। বাম ও অতিবাম বিপ্লবীরা নীরব, কর্তব্যবিমূঢ়। জাতীয় নেতৃত্ব উদাসীন দেশ নাকি প্রস্তুত নয়। সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করিলেন - 'দেশপ্রস্তুত, প্রস্তুত নয় নেতৃত্ব।'

১৪. মরিয়া হইয়া সুভাষচন্দ্র একবার শেষ চেষ্টায় নামিলেন। ছোট ছোট আন্দোলনের মধ্য দিয়া জনগনকে সংগ্রাম মুখী করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি চালাইলেন।

১৫. কুখ্যাত 'হল্‌ওয়েল মনুমেন্ট' অপযারণের আন্দোলন আরম্ভ হইল। সুভাষচন্দ্র বন্দী হইলেন। সংগ্রামী জনতা উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিল। ইংরেজের টনক নড়িল। আন্দোলন জয়যুক্ত হইল। 'হল্‌ওয়েল মনুমেন্ট' অপসারিত হইল। জনতার উচ্ছ্বাস থিতাইয়া আসিল। জাতীয় নেতৃত্ব সমান স্থানুবৎ সংগ্রাম বিমুখ। বামপন্থী ও বিপ্লবীরাও পূর্ববৎ বিমূঢ়, নীরব। জাতি বিভ্রান্ত হতাশায় আচ্ছন্ন। বন্দী সুভাষচন্দ্র পথের সন্ধানে স্বপ্নমগ্ন।

১৬. পথের সন্ধান মিলিল। পরিকল্পনাও প্রস্তুত। বন্দী সুভাষচন্দ্র মুক্তির দাবীতে আমরণ অনশন শুরু করিলেন। বৃটিশরাজ তাঁহাকে শর্তাধীনে গৃহবন্দী করিয়া মুক্তি দিতে বাধ্য হইল। সুভাষচন্দ্র তাঁহার স্বরচিত পূর্ব-পরিকল্পনামত আগাইয়া চলিলেন। ২৭শে জানুয়ারী ১৯৪১ সন, প্রভাত সূর্যের আনন্দকেও ছাপাইয়া উঠিয়া সারা দেশকে মাতাইয়া তুলিল একটি ছোট্ট প্রভাতী সংবাদ—'বৃটিশরাজের সমস্ত সতর্কতাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া মুক্তি পাগল আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক ভারতপথিক সুভাষচন্দ্র বিদেশের পথে পাড়ি দিয়াছেন। উদ্দেশ্য অন্যপথে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন বেগ সঞ্চার।

১৭. সুভাষচন্দ্রের বিদেশ যাত্রা ও বিদেশের সহায়তায় মুক্তি যুদ্ধের এই দুঃসাহসিক

অভিযানের নানা কুব্যাখ্যা ও কুৎসা মুখসর্বস্ব বামপন্থী কাগুজে বিপ্লবী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাহার বিরোধিতাও তাঁহারা করিয়াছেন। অথচ তাঁহারাই কিন্তু আবার পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ফরাসী, যুগোশ্লাভিয়া, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিদেশের সহায়তায়, কোথাও স্বাধীনতা রক্ষা, কোথাও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, এমন কি কোথাও কোথাও আক্রমণ, সম্প্রসারম এবং আগ্রাসী নীতিরও সমর্থন করিয়াছেন। এ এক বিচিত্র নীতি। কিন্তু কোথাও থাকিত আজ বৃটেন, ফরাসী বা চীন-রাশিয়ার স্বাধীনতা, যদি না আমেরিকা তাহার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অঢেল ও অফুরন্ত সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিত? 'আমার শত্রুর যে শত্রু, সে আমার মিত্র', রাজনীতি ও কূটনীতির এই সর্বগ্রাহ্য নীতি অবলম্বন করিয়া, একক সুভাষচন্দ্র আগাইয়া চলিলেন তাঁহার স্বরচিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে। সেদিন যিনিই যাহা বলিয়া থাকুন না কেন, আজ কিন্তু সকলেই সুভাষচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাকি ছিল সব কিছুর একমাত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষি, কলির কুম্ভকর্ণ, আজ তাহারও ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তবে সময় লাগিয়াছে মাত্র ঊনত্রিশটি বছর। এতদিনের ফ্যাসিস্ট, কুইসলিং, জাপানী এজেন্ট, সুভাষচন্দ্র আজ জাতে উঠিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র হইয়াছেন আজ খাঁটী দেশপ্রেমিক।

১৮. আর তাঁহার মুক্তি অভিযানের ফলেই নাকি ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইয়াছে। এতদিনের 'ঝুঁটা আজাদী' আজ খাঁটী আজাদীতে পরিণত হইয়াছে। যাক্ কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া একথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুভাষচন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিয়া এবং বিদেশের সহায়তায় জাতীয় মুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা চালাইয়া সামান্যতম কোন ভুল বা অন্যায় করেন নাই। এবং একথাও আজ নিঃন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহার সর্বাধিনায়কত্বে পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি অভিযানই ভারতকে স্বাধীনতার দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

১৯. সুভাষচন্দ্র অবিচল অটুট তাঁহার সঙ্কল্প। প্রয়োজনে পথের পরিবর্তন মানে আদর্শের বিচ্যুতি নয়। অন্যের প্রশংসা বা বিরুদ্ধ সমালোচনার পরোয়ানা না করিয়া একক সুভাষচন্দ্র আগাইয়া চলিলেন তাঁহার স্বরচিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে। তিনি বলেন যে 'অপরে কি বলবে বা না বলবে, আমি তার বাইরে। আমি জানি আমাকে কোন লক্ষে পৌঁছাতে হবে। যে মাতৃভূমির সেবার ব্রত নিয়ে, আমি আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছি, সে ব্রত ঠিক কি ভাবে পূর্ণ করব, সে আমিই জানি।' অন্যত্র তিনি বলেন, "চাই আদর্শে বিশ্বাস, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, ভারতের গৌরবময় অতীতে বিশ্বাস। যার যেরূপ শক্তি তাকে তদনুরূপ কর্মক্ষেত্র ঠিক করে নিতে হবে। যার যে রূপ ক্ষমতা তাকে সেই ক্ষমতাই ফুটিয়ে তুলতে হবে" (আনন্দবাজার-দিনের বাণী)।

২০. তবুও সুভাষচন্দ্রের বিদেশে যাইবার ঐতটুকু ইচ্ছাও হইত না, যদি তিনি বুঝিতেন

বই বইয়ের ঠিকানা

যে, জাতীয় নেতৃত্ব ও বামপন্থীদের তিনি সংগ্রামমুখী করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সামিল করিতে পারিবেন। সবরকমের চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি কোন আশাই দেখিতে পাইলেন না, তখনই তিনি মরিয়া হইয়া আন্তর্জাতিক সংস্পর্শের সুযোগ লইয়া অন্যপথে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে বিদেশের পথে পা বাড়াইয়াছিলেন। ১৯৪৪ সনে, ভারত অভিযানের পূর্ব মূহুর্তে গান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া সুভাষচন্দ্র এক বেতার ভাষণে-তাঁহার বিদেশ যাত্রার কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন যে, এই বিপদ সঙ্কুল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণের পূর্বে তিনি ইহার সকল দিক সতর্কভাবে অনুধাবন করিবার জন্য বহুদিন রাত ও মাস অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার যদি এতটুকুও আশা থাকত যে, বিদেশ থেকে সংগ্রাম চালান ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে, তাহলে এই সঙ্কটের সময় আমি কখনও ভারত ছেড়ে আসতাম না।" (আনন্দবাজার-২৩.১.৭০)

২১. চরম সিদ্ধান্ত, দুঃসাহসিক অভিযান ১৯৪১ সনের ১৭ই জানুয়ারী গভীর রাত্রে, সুভাষচন্দ্র তাঁহার কলিকাতার স্বগৃহ হইতে অন্তর্ধান করিয়া এক দুঃসাহসিক অভিযানে জার্মানীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে প্রবাসী ভারতীয় এবং যুদ্ধবন্দী বৃটিশ ভারতীয় সেনানীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারত অভিযানের প্রস্তুতি চালাইলেন। ইউরোপে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, সুভাষচন্দ্রের এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। অন্যদিকে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দ্রুত গতিতে; ইংরেজ, ফরাসী ও ডাচ পদানত উপনিবেশগুলি দখল করিতে করিতে আসিয়া ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিকল্পনার মহানায়ক বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তখন জাপানে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনিতেছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নূতন উৎসাহে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মুক্তি যুদ্ধের সামিল করিলেন এবং জাপানের হাতে বন্দী বৃটিশ ভারতীয় সেনানীদের সংগঠিত করিয়া আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করিলেন। বার্দ্ধক্যের অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী, অপেক্ষাকৃত একজন তরুণ অধিনায়কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং জাপান সরকারের সহযোগিতায় জার্মানী হইতে সুভাষচন্দ্রকে আনিবার বন্দোবস্ত করেন। সুভাষচন্দ্র আর একটি ততোধিক দুঃসাহসিক অভিযানে ডুবো জাহাজে করিয়া জার্মানী হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রবাসী ভারতীয়, ভারত স্বাধীনতা লীগ ও আজাদ হিন্দ সেনানীদের এক সাধারণ সমাবেশে সুভাষচন্দ্রকে পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং সর্বসমক্ষে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের ভার সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিলেন। সুভাষচন্দ্রও

তরিৎগতিতে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পুনর্গঠিত করিয়া এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া বার্মার পথে ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাহারা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একাত্ম হইয়া মুক্তি যুদ্ধের সামিল হয়। জাপান সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রপ্রধানরাই সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখিতেন।

২২. অভিযান শুরু হইল। সুভাষচন্দ্রের সর্বাধিনায়কত্বে পরিচালিত ভারতের মুক্তি ফৌজ আজাদ হিন্দ বাহিনী, এক দুর্দ্ধর্ষ সশস্ত্র অভিযানে ভারত সীমান্ত ভেদ করিয়া ইম্ফল ও কোহিমার রণাঙ্গনে ইংরেজ বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া স্বাধীন ভারতের বুকে (মৈরাংয়ে) জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিল। এই সময় সুভাষচন্দ্র জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বামপন্থীদের কাছে বার বার আবেদন জানাইতে লাগিলেন, যাহাতে তাঁহারা দেশের অভ্যন্তরে আন্দোলন শুরু করিয়া এই মুক্তি অভিযানের সামিল হন। এই উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র তাঁহার কিছু বিশ্বস্ত কর্মীকে ডুবো জাহাজে ও বিমানে করিয়া ভারতে পাঠাইয়াও ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শোনা যায় বিপ্লবের নামাবলী গায়ে জড়াইয়া কিছু কিছু মুখোশধারী বিপ্লবী, সুভাষচন্দ্রের প্রেরিত সেই সব বিশ্বস্ত কর্মীদের নানা সদুপদেশ দিয়া ফিরাইয়া দেয় এবং কেহ কেহ বা তাঁহাদের উপস্থিতির কথা পুলিশের কানে দিয়া সুভাষচন্দ্রের সেই সব বিশ্বস্ত কর্মী ও তাঁহাদের সাথীদের ধরা পড়িবার কাজে সাহায্যও করে। আর একদল মহাবিপ্লবী তখন মহাব্যস্ত হইয়া পৃথিবীর ঘৃনিততম সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলকে জনতার শিবিরে বন্দী করিয়া তাহার গায়ে লাল রং মাখাইয়া লাল চার্চিলের লাল পেয়াদা সাজিয়া ভারতের মুক্তি ফৌজ আজাদ হিন্দ বাহিনী ও সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নামিয়া পড়ে। অপর একদল বিপ্লবী তখন কারান্তরালে বসিয়া বিপ্লবের জাবর কাটিতে ছিলেন এবং আত্মপ্রবঞ্চনার দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন। ভাবখানা এই, কারাগারে আছি তাই, বাহিরে থাকিলে বিপ্লবের খেলা দেখাইতাম। অবশ্য কারারুদ্ধ এবং কারাগারের বাহিরের সেই সব মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেই হইবে যাঁহারা সেই কঠিন দিনগুলিতে সব রকমের সব বিপদের ঝুঁকি লইয়াও সেই অভিযানে সুভাষচন্দ্রকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং অভ্যুত্থানের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সব কিছুই ব্যর্থ হইল। ঘরের ছেলে কাছে আসিয়াও ফিরিয়া গেলেন সীমান্তের ওপার হইতে, বড় ব্যথা লইয়া। কে জানে, কোন মহাসাধনায় আজ তিনি ধ্যানমগ্ন। কবে ভারত জনমনের হৃদয়ের রাজা আবার ফিরিয়া আসিবেন, তাহারই পথ চাহিয়া সারা ভারত আজ অধীর আগ্রহে দিন গুনিতেছে।

বই বইয়ের ঠিকানা

২৩. জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পশ্চাদাপসারণ করিতে হইল। সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান করিলেন কোন এক অজ্ঞাতলোকে। বিদায়ের প্রাক্কালে আজাদ হিন্দ সেনানীদের এক সাধারন সমাবেশে এক ভাবগম্ভীর ভাষণে, সুভাষচন্দ্র এই বলিয়া বিদায় নিলেন যে, 'আমাদের এই সাময়িক পরাজয়ে হতাশ হইবার বা ভাঙ্গিয়া পড়িবার কোন কারণ নেই। নূতন পর্যায়ে আবার আমাদের সংগ্রাম শুরু হইবে। জয় আমাদের হইবেই। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য উদয়ের পথে'। ''আমি আজ তোমাদের হাতে, তোমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা তোমাদের জাতির সম্মান এবং ভারতীয় যোদ্ধার মর্যাদা রক্ষার ভার দিয়া বিদায় লইতেছি'' (আনন্দবাজার ২৩.১.৬৭)। নূতন পরিবেশে আবার দেখা হইবে। সুভাষচন্দ্র আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু জনমনে আজও তিনি অম্লান, অম্লান তাঁহার আদর্শ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম।

২৪. বিভিন্ন পর্যায়ের বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং বিশেষভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩২ সনের আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৪২ সনের ভারত ছাড় আন্দোলন ভারতে এক প্রচণ্ড গণ জাগরনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই জাগ্রত জনমনের কাছে যখন যুদ্ধ শেষে সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর অতুলনীয় বীরত্ব ও কীর্তিকাহিনী আসিয়া পৌঁছাইল কাঁপন ধরাইয়া দিল ভারতের মাটিতে। নানা ধরনের ছোট বড় আন্দোলন ছড়িয়া পড়িল সারা দেশের বুকে। ছাত্র ও যুব আন্দোলন, শ্রমিক ও কৃষক বিক্ষোভ, পুলিশ, বিমান ও নৌ সেনানীদের বিদ্রোহ নেতাজীর নামে সেনাবাহিনী চঞ্চল, ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল যুদ্ধ ফেরৎ বেকারের দল। কাঁপিয়া উঠিল ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তভিৎ। এক প্রচণ্ড বিপ্লবী সম্ভাবনা লইয়া সমস্ত জাতি ঘুড়িয়া দাড়াইল। আতঙ্কগ্রস্ত বৃটিশ সিংহ সর্বত্রই দেখিতেছে সুভাষচন্দ্রের ছায়া। বিপ্লবের সমস্ত আয়োজন ও পরিবেশ প্রস্তুত। প্রয়োজন শুধু নেতৃত্বের। কিন্তু হায় নেতৃত্ব আসিল না। জাতীয় নেতৃত্ব সংগ্রাম বিমুখ, আপোষকামী। আত্মবিশ্বাসহীন, সদা কলহধর্মী বামমার্গী কাগুজে বিপ্লবী দলগুলি ও তাহাদের বিশ্বাসঘাতক নেতারা নীরব, নিস্পৃহ। সুভাষচন্দ্র অনুপস্থিত। ধূর্ত, ক্রুঢ় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহন করিল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ করাইয়া দিল। বৃটিশরাজ তাহার এদেশীয় বংশবদদের সহায়তায় সারা দেশ জুড়িয়া সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়াইয়া দিল। সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশে সারাদেশ জুড়িয়া প্রতিবিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—আর সেই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল বিপ্লবের সমস্ত সম্ভাবনা। জনমত ও নেতৃত্ব বিভ্রান্ত। বামপন্থী ও বিপ্লবীরা পূর্ববৎ নীরব, নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার এই ঘৃনিত কূটচক্রান্তের বিরাট সাফল্যে উল্লসিত। সুযোগ উপস্থিত। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতা হস্তান্তরের 'টোপ'

ফেলিল জাতীয় নেতৃত্বের কাছে। শর্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ মানিয়া লইতে হইবে। সম্মতি জানাইলেন জাতীয় নেতৃত্ব। সুভাষচন্দ্র পূর্বেই দেশবিভাগ মানিয়া না লইবার জন্য বেতারে জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে বার বার আবেদন জানাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ''ভারত যদি বিভক্ত হয়, তাহলে কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবন সব দিক থেকেই ভারত ধ্বংশ হবে''(দিনের বাণী)। ''বহু অনৈক্য ও বৈচিত্র সত্ত্বেও রাশিয়া যদি একটি অখণ্ড রাষ্ট্র রূপে ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারে, তাহলে রাশিয়া থেকে অনেক বেশী ঐক্য ও জাতীয় সংহতি থাকা সত্ত্বেও ভারত কেন একটি অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারবে না।'' ''আমরা ভারত বিভাগের সকল ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করে ঐক্যবদ্ধ এক অখণ্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ'' (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাণী, পৃঃ ১(৪),২(৬)।

২৫. অন্যদিকে গান্ধীজীও ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রাক ভারত বিভাগ মুহূর্তে বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিয়া দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁহার মনোভাবটি গান্ধীজীকে জানাইলে গান্ধীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ''আমি তোমাদের চেয়েও ভারত বিভাগের অধিকতর বিরোধী।'' ''তোমরা যদি দেশ বিভাগ ও প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পার আমি তার নেতৃত্ব দেব'' (সাপ্তাহিক বসুমতি,)। একদল বৃটিশ সাংবাদিক যখন গান্ধীজীকে বলিয়াছিল যে 'দেশবিভাগে বাধা দিলে, দেশ রক্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইবে'। উত্তরে গান্ধীজী তাহাদের বলিয়াছিলেন, 'সেই রক্ত স্রোতে স্নান করিয়া ভারতে একটি নূতন জাতি জাগিয়া উঠিবে'। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রশিষ্যদের দৃঢ়তার অভাব, ক্ষমতার লোভ এবং আদর্শ চ্যুতির কারনে তিনিও ব্যর্থ হইলেন। বামপন্থী ও বিপ্লবীদের কোন সহায়তাও তিনি পাইলেন না। ক্ষুব্ধ গান্ধীজী হতাশার সুরে বলিয়া উঠিলেন ''আমরা হয়ত এখনই ইহার সম্পূর্ণ ফলাফল উপলব্ধি করতে পারিব না, কিন্তু এই মূল্যে ক্রয় করা স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকারময় আমি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমি প্রার্থনা করি ভগবান যেন সেই দুর্দিনের সাক্ষী হতে আমাকে বাঁচিয়ে না রাখেন''(আনন্দবাজার)।

২৬. কূট কৌশলী ইংরেজ নিস্পৃহ ও উদাসীন বামপন্থী রাজনীতির সুযোগ লইয়া, বিভ্রান্ত জাতীয় নেতৃত্বকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ মানিয়া লইতে সম্মত করাইয়া আপন স্বার্থ ও সুবিধা মত দেশটাকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়া তাহাদের এদেশীয় মুরুব্বিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া স্বদেশের পথে ইংল্যাণ্ডে পালাইল।

২৭. সুভাষচন্দ্র চাহিয়াছিলেন অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু আজও তাহা অপূর্ণ। যদিও সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা পাই নাই, কিন্তু খণ্ডিত ভারতের আংশিক ও শর্তাধীন স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। এখন আমাদের কর্তব্য কি।

বই বইয়ের ঠিকানা

কোন পথে সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কি ছিল তাঁহার মত ও পথ। তাঁহার জীবন বাণী হইতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার যে নির্দেশ আমরা পাইয়াছি শেষ পর্যায় আমরা সেই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

২৮. কৈফিয়ৎ ঃ-

আজকের দিনে অতীত যুগের সুভাষ জীবনের অবতারণা কেন করিলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সঙ্গে তাহার সম্পর্কই বা কি, স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্নগুলি আমাদের সামনে আসিতে পারে। আমরা অতীত দিনের সুভাষ জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়কেই শুধু এই আলোচনায় আনিয়াছি, সে অধ্যায়টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সম্ভাবনা লইয়া, জাতির সামনে উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা একটা তুলনামূলক বিচারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ঐ বিশেষ দিনগুলিতে কাহার কি ভূমিকা ছিল। ঐ দিনগুলিতে দক্ষিণপন্থী জাতীয় নেতৃত্ব এবং বামপন্থী ও বিপ্লবী বলিয়া প্রচারিত দলগুলি ও তাহাদের নেতারা একটা গভীর কপট ঘুমে আচ্ছন্ন থাকিয়া সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পুরাপুরি এড়াইয়া গিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র চাহিয়াছিলেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাহার পরম ও চরমতম পরিণতির দিকে লইয়া যাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা শেষ ফয়শালা করিতে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি জাতীয় নেতৃত্ব ও বামপন্থী নামে প্রচারিত দলগুলি ও তাহাদের নেতাদের কাছে বার বার আবেদন জানাইয়াছিলেন এবং চেষ্টাও করিয়াছিলেন যাহাতে এক জোট হইয়া শেষ লড়াইয়ে নামিতে পারেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের আবেদনে সেই দিন কেহ সাড়া দেয় নাই। সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়া সেই দিন যদি জাতীয় নেতৃত্ব ও বামপন্থীরা এক জোট হইয়া দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে হয়ত ভারত তথা বিশ্বের মানচিত্র নূতনভাবে আঁকা হইত। লিখিত হইত নূতন ইতিহাস। কিন্তু তাহা হয় নাই। খণ্ডিত ভারত আজ সম্পূর্ণ এক নূতন পরিবেশে একটি গভীরতম ঐতিহাসিক সঙ্কটের সম্মুখীন। ভারতের ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘন মেঘ। যে কোন মুহূর্তে ঝড় উঠিতে পারে। একটা বিপর্যয় ঘটিয়া যাইতে পারে। খণ্ডিত ভারত আবার খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া তাহার স্বাধীনতা পর্যন্ত হারাইয়া যাইতে পারে। দেশ বিভাগ জনিত আঘাত ও দুঃখের মধ্যেও সে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া খণ্ডিত ভারত ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট, তাহার প্রথম স্বাধীনতা দিবসটি উদ্‌যাপন করিয়াছিল সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা আজ সম্পূর্ণ তিরোহিত। একটা দারুন হতাশায় সমস্ত জাতি আজ আচ্ছন্ন। দিকে দিকে আজ অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার সুর ধ্বনিয়া উঠিতেছে। ভাষা, প্রাদেশিকতা, স্বতন্ত্রতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি সমূহ সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। তাহার উপর আদর্শহীন ক্ষমতা লোলুপ বামপন্থী নামে পরিচিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি

ও তাহাদের নেতাদের নেতিমূলক রাজনীতি ও প্রচার বিভ্রান্তি দেশ ও জাতিকে এক সর্বনাশা পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্যদিকে, ভারত ভূমির দিকে হিংস্র লোলুপ দৃষ্টি লইয়া সীমান্তের ওপারে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে বিদেশী হায়নার দল। বিচ্ছিন্নতাকামী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই পারিপার্শ্বিকতা ও সঙ্কট লইয়া, পৃথিবীর এক ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দিনে উপযুক্ত কাণ্ডারীর অভাবে, কুলহারা, পথভ্রষ্ট ভারত তরণীটি ছুটিয়া চলিয়াছে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এক লক্ষ্যহীন পথে। এই দারুণ সঙ্কটময় দিনে, কে আজ শক্ত হাতে পথ ভ্রষ্ট ভারত তরণীটির হাল ধরিয়া তাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে? সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের জন্য যে কর্মসূচী রাখিয়া গিয়াছেন আমরা যদি সেই কর্মসূচী গ্রহণ করি এবং তাঁহার নির্দেশিত পথে চলিতে পারি, তবেই আমরা এই সঙ্কটময় দিন গুলি হইতে উদ্ধার পাইয়া জাতিকে সঠিক পথে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারিব। অতীতের আমাদের ভুলেভরা দিনগুলি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সঠিক পথ নির্বাচন করিতে এবং বর্তমানের এই কঠিন ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিতে আমরা আবার যেন ভুল না করি, তাহারই জন্য আমরা অতীত দিনের সুভাষজীবনের সংক্ষেপে শুধু সেই অংশটুকুই আলোচনায় আনিয়াছি, যে অংশটি বর্তমানের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত থাকিয়া ভবিষ্যৎ চলার পথে আলোকবর্তিকা হাতে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। মহাজনদের কাছ থেকে আমরা সব সময়েই শুনিতে পাই 'দেয়ালের লেখা পড় ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ কর'। মহাজনদের উপদেশ দেওয়ার মত ধৃষ্টতা আমাদের নেই, তাই সবিনয়ে তাহাদের কাছে নিবেদন করিব— 'তোমরাও একবার দেয়ালের লেখা পড়, ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ কর,' আবার ভুল করিও না। ইতিহাস আমাদের উপহার দিয়াছে 'সুভাষচন্দ্রকে', সুভাষচন্দ্র আমাদের উপহার দিয়াছেন, জাতীয়তা ও সমাজবাদের সমন্বয়ে গড়া তাঁহার জীবন দর্শন, 'জাতীয়-সমাজবাদকে'। আমরা যদি সুভাষচন্দ্রের জীবন-দর্শন, 'জাতীয়-সমাজবাদী' তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারি একমাত্র তবেই আমরা আজকের দিনের আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইব। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে চাই ত্যাগব্রতে দিক্ষিত, আদর্শবান, সুসংগঠিত ও কঠোর শৃঙ্খলা পরায়ন দুঃসাহসী—'একটি সংযুক্ত বিপ্লবী দল'—যাহাদের কঠোর সঙ্কল্প, এই কঠিন দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবে।

প্রথম অধ্যায় শেষ।

তারাপ্রসাদ গুপ্ত

২৩.১.৭২

বই বইয়ের ঠিকানা

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়া।

১. আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা পাই নাই-কিন্তু খণ্ডিত ভারতের শর্তাধীন স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। এখন আমাদের কর্তব্য কি। কোন পথে আমরা স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিব। কি হইবে আমাদের মত ও পথ। সেই আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে, আমরা একবার বিচার করিয়া দেখিতে চাই যে, দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক মতামতগুলি আমাদের সমস্যা সমাধানে, সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারিয়াছে কিনা। যদি দেখা যায় যে, দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক মতামত গুলিই আমাদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম, তাহা হইলে আর একটি নূতন মত ও পথের কথা বলিতে যাওয়ার নিশ্চয়ই কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই আমরা বর্তমান আলোচনায় অগ্রসর হইব।

২. আমরা মনে করি, দেশের বর্তমান কোন রাজনৈতিক দলই, এমন কোন মত ও পথের সন্ধান দিতে পারে নাই বা এমন কোন কর্মপন্থা গ্রহন করে নাই, যে পথে আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া জাতিকে সঙ্কট মুক্ত করা যায়। তাই সঙ্কট দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, একমাত্র সুভাষচন্দ্রের নির্দেশিত মত ও পথেই দেশের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া জাতিকে সঙ্কট মুক্ত করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করা সম্ভব। এই বিশ্বাস নির্ভরতার জন্যই আমরা আমাদের বক্তব্যটি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের মত ও পথটি জাতির সামনে বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে আমরা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক মতামতগুলির বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দ্বিতীয় পর্বে আমাদের মূল বক্তব্যটি উপস্থিত করিব।

৩. সারা ভারতে আজ ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা পনের বিশটার কম হইবে না। ইহাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি দলের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই— আছে কিছু প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক বা জেলাওয়ারী দাবীদাওয়া। জনমনে ইহাদের প্রভাব খুবই সীমিত, তাই ইহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনায় আমরা যাইব

না। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়াটি, মার্কসবাদ -সমাজবাদের ঝড়ো হাওয়ার পরিপূর্ণ। সকলেই মার্কসবাদী-সমাজবাদী। তাই প্রথমে আমরা মার্কসবাদ-সমাজবাদ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করিয়া পরবর্তীকালে, আমাদের মূল বক্তব্যটি উপস্থিত করিব। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক মতামতগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১। গান্ধীবাদ, ২। গনতান্ত্রিক সমাজবাদ, ৩। মার্কসবাদ। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা গান্ধীবাদ ও গনতান্ত্রিক সমাজবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব মার্কসবাদ সম্বন্ধে।

প্রথম পরিচ্ছেদ—গান্ধীবাদ

'গান্ধীবাদ'-নামে একটা কথা প্রচলিত আছে সত্য। কিন্তু গান্ধীবাদ কি, গান্ধীবাদ বলিতে কি বুঝায় আমরা জানিনা। গান্ধীজী নিজেও তেমন কিছু বলিয়া বা লিখিয়া যান নাই। তিনি সব সময়েই বলিতেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী। তিনি যখন কোন সমস্যার সম্মুখিন হইতেন, তখন সেই সমস্যার সমাধানে তাঁহার নিজস্ব বক্তব্যটি তিনি প্রকাশ করিতেন। অপরের কাছে সেটা বোধগম্য না হইলে বা রহস্যময় মনে হইলে, তিনি বলিতেন যে—'তিনি, তাঁহার মনের আলোকে এই নির্দেশ পাইয়াছেন। এই 'মনের আলো', অপরের কাছে যতই রহস্যময় মনে হউক না কেন, গান্ধীজীর কাছে, এই মনের আলোর নির্দেশই ছিল একমাত্র অমোঘ সত্য। তবুও 'গান্ধীবাদ' নামে একটা কথা প্রচলিত আছে। এই প্রচলিত অর্থে, 'গান্ধীবাদ' বলিতে সাধারনত বুঝা যায়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক অর্থাৎ জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে, কোন সমস্যা দেখা দিলে শান্তি পূর্ণ উপায়ে সত্য ও অহিংসার পথে তাহার সমাধান করা বা সমাধানের চেষ্টা করা। এক কথায় ইহাকেই বলা চলে — 'গান্ধীবাদ।' বর্তমান ক্ষমতাশীল দল ও রাষ্ট্র নেতারা নিজেদের গান্ধীবাদী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন এবং সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাহারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আমাদের এই আলোচনাটি গান্ধীজীর পথে সমাজবাদী সমাজ গঠন সম্ভব কিনা, সেই আলোচনাতেই রাখিব।

গান্ধীজীর সমাজবাদ ও গনতান্ত্রিক সমাজবাদ।

গান্ধীজীর সমাজবাদী চিন্তা ও তাঁহার কর্মসূচীকে তাঁহার মন্ত্র শিষ্যরাই হত্যা করিয়াছেন। গান্ধীজার সমাজবাদ কি, গান্ধীজীর সমাজবাদ বলিতে কি বুঝায় তাহার প্রয়োগ পদ্ধতিই বা কি, সেই সম্বন্ধে জনগনকে অবহিত ও প্রভাবিত করিবার সামান্যতম কোন চেষ্টা

বই বইয়ের ঠিকানা

ও ক্ষমতাসীন গান্ধীপন্থীরা গত পঁচিশ বছরে করেন নাই। তাঁহার শুধু তোতাপাখির মত—'গান্ধীজীর পথই একমাত্র পথ, গান্ধীজীর পথেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে.' প্রভৃতি কয়েকটি মুখস্ত বুলি ছাড়া গান্ধীজীর পথটি কি, তাহা কখনও জনগনের সামনে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন নাই।

গনতান্ত্রিক সমাজবাদ কি? বহু ছোট বড় দল ও উপদলই গনতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু গনতান্ত্রিক সমাজবাদ কি, গনতান্ত্রিক সমাজবাদ বলিতে কি বুঝায়, তাহার সঙ্গে অন্যান্য সমাজবাদী চিন্তাধারার পার্থক্যই বা কোথায়, গনতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তারা তাহার কোন স্বচ্ছ ও বিস্তারিত রূপ বা পরিকল্পনা জনসাধারনের সামনে তুলিয়া ধরেন নাই বা ধরিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে 'গনতান্ত্রিক সমাজবাদী' তত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, শ্রী অশোক মেহেতা রচিত 'গনতান্ত্রিক সমাজবাদী' পুস্তকখানা পড়িয়াও 'গনতান্ত্রিক সমাজবাদ' বলিতে শ্রী মেহেতা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন এবং কোন পথেই বা তাহা আসিতে পারে অর্থাৎ গনতন্ত্রের পথে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে, তাহার কোন পরিস্কার ধারনা ঐ পুস্তকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। অন্তত আমরা বুঝিতে পারি নাই। গান্ধীপন্থীরাও গনতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা বলিয়া থাকেন। এই দুই গনতান্ত্রিক সমাজবাদীদের বিরোধ কোথায়, কেন এবং কেনইবা তাহারা একদলে মিলিত হইতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের মিলনের পথে অন্তরায় কোথায়, একথাও তাঁহারা কখন বলেন না। তাই আমরাও জানিনা—বুঝি না।

১. গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্যরা আজ পঁচিশ বছর ক্ষমতাসীন এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক উপায়েই তাঁহারা এই ক্ষমতায় আসিয়াছেন। তবে কেন তাঁহারা এই পঁচিশ বছরেও তাঁহাদের কল্পিত গণতন্ত্রে পথে সমাজবাদী আদর্শের ভিত্তিতে দেশের পুনর্গঠনের কাজটি সফল করিয়া তুলিতে পারিলেন না? বাধা কোথায়?

২. গান্ধীজীর মতবাদ সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, গান্ধীজীও ছিলেন একজন সমাজবাদী চিন্তানায়ক এবং চরম লক্ষ্য হিসাবে তিনিও শ্রেণী ও রাষ্ট্রহীন সমাজের কথা বলিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন "সমাজতন্ত্র একটি সুন্দর শব্দ। আমি নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী বলে মনে করি" (গান্ধীজীর আমার সমাজবাদ, পৃঃ-৩,১০)। রাষ্ট্র সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন, "রাষ্ট্র হল সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত হিংসার প্রতীক। একটি আদর্শ রাষ্ট্রে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে না, কেননা তখন রাষ্ট্রই থাকে না" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী পৃঃ-৫২,৬৩)। গান্ধীজী তাঁহার সমাজবাদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলেন "সমাজবাদী ব্যবস্থায় সমাজের সকল মানুষই সমান। কেহ উচ্চ নয়, কেহ ছোটও

নয়।.....সমাজতন্ত্রে কি রাজপুত্র-কি কৃষক, কি ধনী-কি নির্ধন, কি কর্মচারী-কি মালিক, সকলেই সমান স্তরের" (গান্ধীজীর আমার সমাজবাদ, পৃঃ-৩)। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পথ হিসাবে গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা বলিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন, "সব সময়েই একমাত্র নির্ভেজাল অহিংসার পথেই আমার পদক্ষেপ" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী, পৃঃ-২)। "সমাজবাদ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, সুতরাং উহা অর্জন করার জন্য স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পথ চাই" (দিনের বাণী।) "একমাত্র সত্যাশ্রয়ী, অহিংস পবিত্রাত্মা সমাজবাদীরাই ভারতে ও বিশ্বে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।" (গান্ধীজীর আমার সমাজবাদ, পৃঃ-৫)। সমাজবাদের মূল কথা হইল সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানার অবসান এবং সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা। গান্ধীজী কিন্তু সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকার করিতেন না। তবে তিনি চাহিতেন বিত্তবান মালিক শ্রেণী 'হৃদয়ের' পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অছি হিসাবে সেই সম্পত্তি দেখাশুনা ও ভোগ দখল করিবে। গান্ধীজী বলেন, "তাড়াহুড়ো করে সংস্কার করা যাবে না। যদি অহিংসার পথে তা করতে হয়, তাহলে বঞ্চিত ও বিত্তবান উভয়কেই শিক্ষা দানের দ্বারা তা করতে হবে। বিত্তবানদের নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তাদের উপর কখনও বলপ্রয়োগ করা হবে না।" "আমি পুঁজিপতি ও জমিদারদের হাতে তাঁদের কারখানা ও জমি রাখবার অধিকার দেব, কিন্তু তাঁদের সেই সম্পত্তির তাঁরা অছি মাত্র, একথা যাতে তাঁরা মনে করেন তারও ব্যবস্থা করব।" "উৎপাদনের সকল প্রকার যন্ত্রেরই রাষ্ট্রীয়করণ আমি চাই না।" "উত্তরাধিকার সূত্রেই হোক অথবা ব্যবসা বা শিল্পের দ্বারাই হোক, আমার যদি প্রচুর ধনাগম হয় তাহলে আমাকে জানতে হবে যে সেই সব ধনের মালিক আমি নই। আমি সম্মানজনক জীবন যাপনেরই শুধু অধিকারী এবং লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ জীবন যাপনের যে অধিকার ভোগ করে, আমার অধিকার তার চেয়ে বেশী নয়। সেই ধনের অবশিষ্টাংশ সমষ্টির সম্পত্তি এবং সমষ্টির কল্যাণেই তা ব্যয় করতে হবে। ওরা এই সুবিধাভোগী শ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে চায়। আমি চাই যে সুবিধাভোগীরা তাদের লোভ ও মালিকানাবোধকে অতিক্রম করে নেমে আসুক তাদের স্তরে সারা শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জন করে" (গান্ধীজীর আমার সমাজবাদ, পৃঃ-২৪,১৪,১,৫১)। অন্যান্য সমাজবাদী দৃষ্টিতে ইহা একটি স্ববিরোধী চিন্তা। তবুও একবার দেখা যাক গত পঁচিশ বছরে ক্ষমতাসীন গান্ধীপন্থীরা, গান্ধীবাদী পন্থায় অর্থাৎ সত্য ও অহিংস উপায়ে ক্ষমতা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথে কতটা অগ্রসর হইয়াছেন। স্বাধীন ভারতের গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস আমরা যতটা জানি, তাহাতে একটি রাজা-মহারাজ বা জমিদারও তাহার রাজ্য বা জমিদারী হৃদয়ের পরিবর্তন হওয়ায় প্রজার কল্যাণে উৎসর্গ

বই বইয়ের ঠিকানা

করিয়াছে বা কলকারখানার মালিক ধনিক শ্রেণীর একটি ধনীও স্বেচ্ছায় তাহার মালিকানাধীন কলকারখানার উপর সেই কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে বা উপরোক্ত স্তরের বিত্তবানদের একজন বিত্তবানও নিজ সম্পদ বা বিত্তের উপর স্বেচ্ছায় নিজ অধিকার ত্যাগ করিয়া অছি হিসাবে সেই সম্পত্তির দেখাশুনা বা বিলি বন্দোবস্ত করিতেছে এমন কথা আমরা কখনও শুনি নাই। দেশ স্বাধীন হইবার পর গত পঁচিশ বছরে গান্ধীপন্থীরা তাহার জন্য কোন আন্দোলন বা চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কথাও আমাদের জানা নাই।

৩. অন্যদিকে দেখা যাইতেছে যে স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার, বাস্তববাদী ও দূরদর্শী গান্ধীপন্থী রাষ্ট্রনেতা দৃঢ়চেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজন্য বর্গকে কূটকৌশলে পরাজিত করিয়া এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় বাধ্য করিয়া সাধারণ কিছু সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে তাঁহাদের রাজ্যগুলিকে ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্য জুনাগড় ও হায়দারাবাদের নবাবেরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হইতে অস্বীকার করায় সশস্ত্র অভিযান করিয়া ঐ দুইটি রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হইতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তীকালে পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়াকেও সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমেই ভারত রাষ্ট্রভুক্ত করা হয়। কোন কোন প্রদেশে অংশত জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং কিছু কিছু জীবনবীমা ও কয়েকটি ব্যাঙ্কও জাতীয়করণ করা হইয়াছে, আইন করিয়া ঐ সব সংস্থার মালিকদের রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে বাধ্য করিয়া, এখানে হৃদয় পরিবর্তনের কোন পরিচয় কিন্তু আমরা পাই না। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা প্রভৃতির রাষ্ট্রীয়করণ, দেশীয় রাজ্যগুলির বিলোপ সাধন, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতি যখন শক্তি প্রয়োগ, সংঘর্ষ বা রক্তপাত ছাড়া, শান্তিপূর্ণভাবে, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে, আইনের মাধ্যমে সম্ভব হইয়াছে, তখন গান্ধীবাদীপন্থায়—শান্তিপূর্ণ উপায়ে সত্য অহিংসা ও গণতন্ত্রের পথে ধনিকশ্রেণীর 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটাইয়া ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব হইবে না কেন?

৪. আমরা ইতিহাসের পাতা হইতে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি। মিশরে সামন্ত রাজারা পুরুষানুক্রমে কয়েক যুগ ধরিয়া সুখে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। মিশররাজ ফারুক তখন মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। হঠাৎ একদিন দেখা গেল মিশররাজ ফারুকের সামনে চার সঙ্গী সহ মিশরের প্রধান সেনাপতি জেনারেল নাগুইব। সকলেরই হাতে উদ্যত পিস্তল-লক্ষ্য মিশররাজ ফারুকের মস্তক। একজন সেনানী মিশররাজ ফারুকের সামনে একখানা কাগজ স্বাক্ষরের জন্য তুলিয়া ধরিল। কাগজখানায় লেখা ছিল যে, 'আমি মিশরের রাজা ফারুক স্বেচ্ছায় এবং নিঃশর্তে মিশরের

সিংহাসন ও রাজত্ব ত্যাগ করিয়া আমার সেনাপতি জেনারেল নাগুইবের হাতে মিশরের সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করিলাম'। রাজা ফারুকের সামনে তখন দুইটি মাত্র পথ খোলা ছিল। জীবন-অথবা সিংহাসন। মিশররাজ ফারুক, সিংহাসন ও রাজত্বের বিনিময়ে জীবনকে বাছিয়া লইলেন এবং জেনারেল নাগুইবের হাতে মিশরের সর্বময় কর্তৃত্ব তুলিয়া দিয়া মিশর হইতে চির বিদায় লইলেন। বহু শতাব্দীর পুরাতন সামন্তরাষ্ট্র মিশর ধনতন্ত্রের পথে পা বাড়াইল। সমাজবিকাশের পথে মিশর একধাপ আগাইয়া গেল। একটি গুলি বিনিময় হইল না—এক ফোটা রক্ত ঝড়িল না—একটি সফল সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হইল। এক্ষেত্রে যেহেতু শক্তির কোন প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ছিল না, তবে কি বলিতে হইবে যে এই পরিবর্তন অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লবটি সংঘটিত হইয়াছিল শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে, সত্য ও অহিংসার পথে রাজা ফারুকের হৃদয় পরিবর্তনের কারণে? না। এখানে শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগ হয় নাই বটে, কিন্তু নাগুইবের হাতের উদ্যত পিস্তলের পেছনে ছিল শক্তির পরোক্ষ হুমকি। রাজা ফারুক মাথা নত করিয়াছিলেন শক্তির সেই পরোক্ষ হুমকির কাছে।

৫. আইনের পেছনেও থাকে রাষ্ট্রশক্তির পরোক্ষ হুমকি। 'আইনের' অর্থ হইল হয় তোমাকে তাহার নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে, অন্যথায় 'আইনের নামে' রাষ্ট্রশক্তি বলপ্রয়োগে তোমাকে তাহা নির্দেশ মানিতে বাধ্য করিবে। এই পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। যে কোন উপায়েই হউক বর্তমানের এই অসহনীয় জীবন যন্ত্রণার অবসান ঘটাইয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করিতেই হইবে। কিন্তু গান্ধীজী কথিত 'শান্তিপূর্ণ' উপায়ে, সত্য, অহিংসা ও গণতন্ত্রের পথে মানুষের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' এর সঙ্গে 'আইনের মাধ্যমে' কাহাকেও বাধ্য করিবার কোন সম্পর্ক নেই। গান্ধীজী বলেন- "যাদের সম্পত্তি আছে তাদের আমি সম্পত্তিহীন করতে চাইনা।" "আমি কারও সম্পত্তি কেড়ে নিতে চাই না, তা চাইলে অহিংসার বিধান থেকে বিচ্যুত হতে হবে"। "বিত্তবানদের নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, তাদের উপর কখন বলপ্রয়োগ করা হবে না"। "আমি পুঁজিপতি ও জমিদারদের হাতে তাদের কলকারখানা ও জমি রাখবার অধিকার দেব কিন্তু তাদের সেই সম্পত্তির তারা 'অছি' মাত্র একথা যাতে তারা মনে করে তারও ব্যবস্থা করব"। "ওরা এই সুবিধাভোগী শ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে চায়। আমি চাই সুবিধাভোগীরা তাদের লোভ ও মালিকানা বোধকে অতিক্রম করে নেমে আসুক তাদের স্তরে যারা শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে"। "অহিংসাদ্বারা আমি তাদের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটাব, তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটান সম্ভব" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী, পৃঃ- ২৮,২৪,১৪,৫১)। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের উচ্ছেদ, অংশত জমিদারী প্রথার বিলোপ, কিছু

বই বইয়ের ঠিকানা

কিছু জীবনবীমা ও কয়েকটি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় করণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিত্তবানদের 'হৃদয় পরিবর্তন' - 'অছি ব্যবস্থা' - বা তাহাদের 'লোভ ও মালিকানা বোধকে অতিক্রম করিয়া যাহারা শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তাহাদের স্তরে নামিয়া আসা', ইহার কোন পরিচয়তো আমরা পাই না। তাহা হইলে কি করিয়া ইহাকে আমরা গান্ধীবাদী পন্থা বলিব?

৬. আমরা জানি সমাজবাদ সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে না। কিন্তু আমাদের গান্ধীবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়করা যে সংবিধান রচনা করিয়াছেন এবং যে সংবিধানের বিধান মতে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে, সেই সংবিধানে সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে গান্ধীবাদী পন্থায় শান্তিপূর্ণভাবে, সত্য, অহিংসা ও গণতন্ত্রের পথে, সাংবিধানিক পদ্ধতিতে কি করিয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে?

৭. ভারতের গান্ধীবাদীরা আজ বহুভাগে বিভক্ত। কে বা কাহারা গান্ধীবাদের খাঁটি ব্যাখ্যা তা আমরা জানি না। তবে গান্ধীজীর পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকেই গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ উত্তর সাধকরূপে গণ্য করা হইত। আনুমানিক ১৯৪৭ সনের শেষ বা ১৯৪৮ সনের প্রথম দিকে কলিকাতার ব্রিগেড ময়দানের এক জনসভায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই ধরনের একটা কথা বলিয়াছিলেন যে, 'গান্ধীজী চাহেন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। দেশে কোন পুলিশ থাকিবে না, সৈন্য থাকিবে না। কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় না। পুলিশ ও সৈন্য না থাকিলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে— দুই দিনেই ভারত তাহার স্বাধীনতা হারইয়া বসিবে'। বাস্তবতার দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে সর্দার প্যাটেল ঠিকই বলিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী বলেন-"আমি এমন রাষ্ট্রের কল্পনা করতে পারি এবং করিও যেখানে পুলিশের দরকার হবে না" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী , পৃঃ-৬৫)। বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, মিজো ও নাগা বিদ্রোহ, চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ, পাকিস্তান কর্তৃক কচ্ছ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি সীমান্ত পথে বার বার ভারত আক্রমণ প্রভৃতির সময় যদি ভারতের সশস্ত্র বাহিনী তাহার মোকাবিলা করিতে আগাইয়া না যাইত, তবে কোথায় থাকিত আজ ভারত রাষ্ট্র। গান্ধীজী কিন্তু কোন বিদেশী আক্রমণের মুখেও তাঁহার অহিংস নীতি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। গান্ধীজী বলেন-"বাহিরের কোন আক্রমণ রুখতে গিয়ে প্রয়োজন হলে আত্ম ধ্বংসের জন্যও তাকে তৈরী থাকতে হবে এবং সেই রকমের শিক্ষা তার পাওয়া দরকার" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী, পৃঃ-৭১)। গান্ধীজীর এই উপদেশ ক্ষমতাসীন গান্ধীবাদীরা, কোন বিরোধী রাজনৈতিক দল, এমনকি একজন ভারতীয়ও স্বীকার করিতে রাজী হইবেন,

আমাদেরতা মনে হয় না। ১৯৫০-৫২ সনে তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া হায়দারাবাদের বিদর শহরে এক জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন-"তেলেঙ্গানার হিংসাত্মক ঘটনা একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ বিশেষ। হিংসাকে ততোধিক হিংসা দ্বারা মোকাবিলা করা হলে, অধিকতর হিংসার কারণে সরকারকে দায়ী করা অর্থহীন হবে" (স্টেটসম্যান, কলিকাতা, ২৭.৯.৫২)। গান্ধী উত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ গান্ধীবাদী নেতাদের এই সব কথাও কাজের সঙ্গে গান্ধীজী কথিত সত্য ও অহিংসার পথে-'হৃদয় পরিবর্তন'-এর সম্পর্ক কোথায়?

৮. ভারতের ভয়াবহ বেকার সমস্যা এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে সামনের দিকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইলে দেশে প্রবল ভাবে শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য বলিয়া আমাদের গান্ধীবাদী রাষ্ট্রনায়কেরা, বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একথা মনে করেন। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। গান্ধীজী ছিলেন গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি ও কুটির শিল্পের সমর্থক। গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণ ঘটাইয়া গ্রামীণ অর্থনীতি ও কুটির শিল্পের ভিত্তিতে দেশের পুনর্গঠন করিতে। গান্ধীজী বলেন- "শিল্পায়ন মানবজাতির পক্ষে একটা অভিশাপ হয়ে উঠেছে বলে আমার আশঙ্কা হয়। যে কোন দেশের পক্ষে যে কোন অবস্থাতেই শিল্পায়ন দরকার এ আমি বিশ্বাস করি না। ভারতের পক্ষে তো আরও কম দরকার" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী, পৃঃ-৫৭,৫৮)।

৯. তত্ত্ব হিসাবে গান্ধীজীর মতবাদকে নিন্দা করিবার মত কিছু নেই—বরং ভবিষ্যতের ভাবনা হিসাবে আলোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু তাহা কার্যকরী করা বর্তমানে সম্ভব কিনা, সেইটাই আসল কথা। এই দৃষ্টি হইতে বিচার করিলে গান্ধীবাদের পথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা বা সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা দেওয়া কোনটাই যে বর্তমানে সম্ভব নয়, একথা মনে হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমতাসীন গান্ধীপন্থী রাষ্ট্র নায়করাও একথা ভালই জানিতেন এবং জানেনও। কার্যতঃ, সেই কারণেই, তাঁহারা গান্ধীজীর সত্য ও পথকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের দেওয়া দুই চারিটা দৃষ্টান্ত সহ গান্ধীপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন ভারতের গত পঁচিশ বছরের ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলেই ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত মিলিবে। কিন্তু গান্ধীপন্থীরা মুখে কখনও একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা সব সময়েই বলিয়া চলিয়াছেন গান্ধীজীর পথই একমাত্র পথ এবং গান্ধীজীর পথেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বই বইয়ের ঠিকানা

১০. এবার আমরা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিব আজ পর্যন্ত প্রকৃতি প্রানিজগৎ, সমাজবিকাশ বা রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে মৌলিক পরিবর্তনগুলি ঘটিয়া গিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহার মূল সূত্রটি কি। এই সূত্রটি ধরিতে পারিলেই আমরা বুঝিতে পারিব গান্ধীজীর পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাইয়া সমাজে বা রাষ্ট্র জীবনের কোন মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব কিনা।

১১. প্রাকৃতিক জগতের দিকে তাকাইলে আমরা কি দেখিতে পাই। কোন গাছের বীজ মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে, ঐ বীজ মাটির রস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অঙ্কুরিত হইতে থাকে এবং উপযুক্ত সময়ে তাহার মাথার উপরের মাটির প্রাচীরটাকে সহ্যের আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং শিশু বৃক্ষ নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেয়। অন্যথায় ঐ বীজকে মাটির নিচেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে হয়—গাছ আর জন্ম লইতে পারে না। প্রাণিজগতের ইতিহাস কি বলে? ভ্রূণ মাতৃগর্ভ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতা পাইতে থাকে। ভ্রূণ যখন শিশুরূপে পূর্ণতা পায়, তখন সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইবার অর্থাৎ জন্ম লইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে এবং আঘাতের পর আঘাত হানিয়া মাতৃগর্ভের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর আলো বাতাসে আসিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেয়। অন্যথায় মাতৃগর্ভেই শিশুকে শেষ নিঃশ্বাস লইতে হয়-জন্ম আর লইতে পারে না। পাখির ডিম হইতেও ঐ একই উপায়ে বাচ্ছা বাহির হইয়া আসে। প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করে যে-'শক্তিই হইল যে কোন সার্থক নবজন্মের মূল সূত্র।

১২. মানবসমাজের ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলেও আমরা ঐ একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইব যে,'শক্তি'ই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেয়। আদর্শ নীতিকথা সবই শক্তির অনুগামী। আদর্শ কখন শুধু আদর্শের কারণেই জয়যুক্ত হইয়াছে ইতিহাস তেমন কোন সাক্ষ্য দেয় না-তাহাকে প্রতিষ্ঠা দেয়-'শক্তি'। শারীরিক শক্তিহীন আদর্শ সে যতই উচ্চমার্গের হউক না কেন, সে কখন মানব ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিরোধী মতাদর্শ হইতে অধিকতর শারীরিক শক্তির অধিকারী হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার যে সব মৌলিক পরিবর্তন আসিয়াছে, সব পরিবর্তনই আসিয়াছে শক্তির মাধ্যমে। সমাজ বিকাশের পথে মানবজাতির অগ্রগতি এই সাক্ষ্যই দেয়। দাস যুগের দাস মানুষ প্রবল বিদ্রোহের মধ্য দিয়াই দাসপ্রভু বা সর্দারদের হাত হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়াছিল। সামন্তযুগের কৃষি বা ভূদাসেরা সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ করিয়া নিজেদের মুক্ত করে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাইয়া যে কয়েকটি দেশে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সব কয়েকটি ক্ষেত্রেই

এই কাজটি সফল হইয়াছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। বুদ্ধদেব ও যীশু খ্রীষ্টের সত্য, প্রেম ও অহিংসার বাণী বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট রাজাদের রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায়। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের সত্য, প্রেম ও অহিংসা ধর্মের বিশ্বজনীন আবেদনে নয়। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ, তাঁহার নূতন মতবাদ লইয়া মক্কার জনমণের কাছে হাজির হইলে, মক্কাবাসীরা তাঁহাকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করে। শক্তি সংগ্রহ করিয়া মহম্মদ তরবারি হস্তে যখন মক্কায় পুনঃপ্রবেশ করিলেন মক্কাবাসীরা তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ইসলাম ইয়োরোপে পা বাড়াইল এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে আগাইয়া চলিল। ইয়োরোপের সত্য, প্রেম ও অহিংস ধর্মের উপাসক খ্রীষ্ট রাজারা, বার বার সশস্ত্র ও অহিংস রাষ্ট্র শক্তির সহায়তায় ইসলামের গতিরুদ্ধ করিয়া ইয়োরোপে খ্রীষ্ট ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেয়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, পুরুর পরাজয়, বীন কাসিমের সিন্ধু আক্রমণ, সিন্ধুরাজ দাহিরের পরাজয়, মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ,-চৌহান রাজ পৃথ্বীরাজের পরাজয়, বক্তিয়ারের নবদ্বীপ আক্রমণ, লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়, ক্লাইভের মুর্শিদাবাদ অভিযান, সিরাজের পরাজয়, এই সবই হইল আদর্শহীন প্রবল হিংস্র বর্বর শক্তির কাছে দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার কারণে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার আদর্শ সংগ্রামের পরাজয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তাহার পরবর্তিকালে ইয়োরোপ ও এশিয়ার দুইটি শক্তিধর রাষ্ট্র আদর্শ ও নীতিহীনভাবে শুধু গায়ের জোরে কয়েকটি রাষ্ট্রের অংশবিশেষ এবং কয়েকটি গোটা রাষ্ট্রকেই দখল করিয়া লইয়া নিজ নিজ রাষ্ট্রদেহকে স্ফীত কায় করিয়াছে। ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির মূলেও আছে আদর্শ ও নীতিহীন এক বর্বর ও ক্রূঢ় শক্তির খেলা। বৃটিশ স্বার্থে ও কূটচক্রান্তে পরিচালিত এবং কমিউনিষ্ট দল সমর্থিত মুসলীম লীগ ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিল। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী দলগুলি প্রবলতর শক্তির অধিকারী হইয়াও শক্তি প্রয়োগে তাহার প্রতিরোধে আগাইয়া না আসিয়া, সর্বাঙ্গে ভূয়া আদর্শের প্রলেপ মাখাইয়া ক্লীবের মত নিজেদের নিরাপদ দুরত্বে সরাইয়া রাখিল। সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত ইংরেজ, নিজ স্বার্থ ও সুবিধা মত অখণ্ড ভারতকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া পাকিস্তানের জন্ম দিয়া, ভারতকে অশেষ দুর্গতি ও সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়া স্বদেশে ইংল্যাণ্ডে পালাইল। যতদিন পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন ভারতের এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ আদর্শনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী দলগুলি যদি একজোট হইয়া ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে শক্তিবলে রুখিয়া দাড়াইত এবং পাল্টা আঘাত হানিত তাহা হইলে ইংরেজ তাহার দুই সেবাদাস মুসলীম লীগ ও কমিউনিষ্ট দল একই সঙ্গে ভারতের মাটি হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইত

বই বইয়ের ঠিকানা

এবং অখণ্ড ভারতই তাহার স্বাধীনতা লাভ করিত। কিন্তু তাহা হয় নাই - কারণ আমাদের পথটি ছিল ভুল। আমাদের শক্তি ছিল-কিন্তু তাহার ব্যবহার ছিল না। ইতিহাসের পর্যালোচনায় বার বার একমাত্র এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয় যে, সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের মূল কথা, 'আদর্শ' নয় - 'শক্তি'। তবে শক্তির সাথে আদর্শের মিলনই শ্রেষ্ঠ সমাধান বা শেষ কথা।

১৩. তাহা হইলে আদর্শ বা নীতির কি কোন মূল্যই নেই? আছে—নিশ্চয়ই আছে। আদর্শই মানুষকে সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়। আদর্শের প্রেরণাতেই ব্যক্তি মানুষ সমাজকল্যাণে আত্মাহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু আত্মোৎসর্গের উদ্দেশ্য তখনই সফল হয়, যখন সেই আদর্শের পেছনে প্রয়োজনীয় শারীরিক শক্তির সমাবেশ করা যায় এবং সেই শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া জয়কে সুনিশ্চিত করা যায়। যে কোন দেশের যে কোন সফল সমাজবিপ্লবের মূলে আছে একটিই মাত্র সত্য - 'আদর্শ ও শক্তির মিলন'। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্য দিয়াও আমরা এই শিক্ষাই পাই। ১৯৪৭ সন হইতে ১৯৫৭ সনের ইতিহাস নিরবিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। এই সময়কাল প্রত্যেকটি আন্দোলন ও আত্মাহুতি ভবিষ্যৎ সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণা দিয়াছে এবং শক্তি যোগাইয়াছে। মোহনলাল-মীরমদন প্রভৃতির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম উদ্বুদ্ধ করিয়াছে মঙ্গল পাণ্ডে, নানা সাহেব-ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া তোপী প্রভৃতিকে স্বাধীনতা উদ্ধারের সংগ্রামে। চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই-সত্যেন প্রভৃতির আত্মহুতি জন্ম দিয়াছে আমীরচাঁদ-অবোধবিহারী-কর্তার সিং-পিংলে, বাঘাযতীন-নলিনী বাগচী-আসফাকুল্লা-যতীন দাস, ভকৎ সিং রাজপুর শুকদেব-চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য সেন-তারকেশ্বর-প্রীতিলতা, বিনয়-বাদল-দীনেশ, উধম সিং, মাতঙ্গিনী হাজরা, রামেশ্বর-আবদুস সালাম প্রভৃতি অজস্র শহীদকে। ১৯০৫ সনের 'বঙ্গ ভঙ্গ' আন্দোলন অনুপ্রেরণা দিয়াছে ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনকে। ১৯২১ সনের 'অসহযোগ' আন্দোলন অনুপ্রেরণা দিয়াছে ১৯৩০ সনের 'আইন অমান্য' আন্দোলনকে। ১৯৩০ সনের আইন অমান্য আন্দোলন শক্তি যোগাইয়াছে ১৯৪২ সনের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে। এই সময়কার ইতিহাস অজস্র শহীদের আত্মাহুতির ইতিহাস, কিন্তু স্বাধীনতা আমরা পাই নাই। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতার দাবীকে তখনই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, যখন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রচণ্ড পদাঘাতে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত সম্মান ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছিল। সেই দিন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের 'হৃদয়ের' পরিবর্তন হইয়াছিল ঠিকই!

কিন্তু কেন? কারণ একদিকে সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের মুক্তিকামী জনতা শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত এবং দিকে দিকে চলিতেছিল তাহারই বিস্ফোরণ। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অপূর্ব কীর্তিকাহিনী ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্ভরশীল আশ্রয় ও শেষ ভরসা ভারতীয় সৈন্যদলের আনুগত্যে ফাটল ধরাইয়া দিল। ফলে ভারতে ইংরেজ রাজ শক্তির ভারসাম্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাই অধিকতর বিপর্যয়ের হাত হইতে ইংরেজ স্বার্থকে রক্ষা করিবার তাগিদে সেই দিন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাহার 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটাইয়াছিল এবং আমাদের স্বাধীনতার দাবীকে মানিয়া লইয়া, ভারত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এখানেও শেষ মীমাংসার মূল সূত্রটি হইল - 'শক্তি'। এই শক্তির পেছনে ছিল ভারতের বন্ধন মুক্তির জ্বলন্ত আদর্শ। 'শক্তি' প্রতিষ্ঠা দিল 'আদর্শকে'। মিলন ঘটিল শক্তির সঙ্গে আদর্শের। এখানে শক্তির কোন প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দেখিনা বটে, কিন্তু শক্তির আত্মপ্রকাশ ও বিস্ফোরণের লক্ষন ছিল সুস্পষ্ট।

১৪. এইবার আমরা গান্ধীজীর বিরাট কর্মবহুল জীবনে গানধীবাদের সাফল্যের সন্ধান করিয়া দেখিব। গান্ধীজী বলেন-"যতদিন না সমগ্র সমাজকে আমার মতে টানতে পারে, ততদিন বসে থাকব না। আমি সোজাসুজি নিজেকে দিয়েই কাজ আরম্ভ করব। আমার যদি ৫০ খানা মোটর গাড়ি এমনকি দশ বিঘা জমিও থাকে তাহলে আমার ধারণা অনুযায়ী আর্থিক সমতা আনার আশা আমি করতে পারি না। সেই উদ্দেশ্যে আমাকে নিম্নতম দরিদ্রের স্তরে নামতে হবে" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী, পৃঃ-৩৫)। গান্ধীজী নিজ জীবনের ক্ষেত্রে এই নীতির পূর্ণপ্রয়োগ করিয়াছিলেন ঠিকই। তিনি নিজ ঘরবাড়ী, বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি সব কিছুই পরিত্যাগ করিয়া এক সর্বত্যাগী ফকির হইয়া তাঁহার সমাজবিপ্লবীর কর্মজীবন শুরু করেন এবং গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আমৃত্যু সেই পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯২০ সন হইতে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত এই দীর্ঘ আটাশ বছরে গান্ধীজী তাঁহার সর্বভারতীয় বা প্রাদেশিক বিত্তবান মন্ত্রশিষ্য বা সহকর্মীদের একজনেরও 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটাইয়া তাঁহার মতে আনিতে অর্থাৎ আর্থিক সমতা আনার উদ্দেশ্যে দরিদ্রের নিম্নতম স্তরে নামাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। গান্ধীজী বলেন, "আমি পুঁজিপতি ও জমিদারদের হাতে তাদের কলকারখানা ও জমি রাখবার অধিকার দেবো"। "বিত্তবানদের নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তাদের উপর কখন বলপ্রয়োগ করা হবে না" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী, পৃ-১৪,২৪)। তাহা হইলে পরিবর্তন আনা যাইবে কি ভাবে? গান্ধীজী বলেন-"অহিংসাদ্বারা আমি তাদের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটাব। তাদের পরিবর্তন করা সম্ভব" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী, পৃ-১৪,২৪)। গান্ধীজী নিজে

বই বইয়ের ঠিকানা

তাঁহার এই মতবাদ লইয়া প্রায় আটাশ বছর ব্যর্থ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। গান্ধী উত্তর যুগে আজ চব্বিশ বছর গান্ধীপন্থীরাই ক্ষমতাসীন। সর্ব সাকুল্যে এই বাহান্ন বছরের মধ্যে ভারতের একটি রাজা-মহারাজা, জমিদার-তালুকদার বা ধনিক শ্রেণীর একজন ধনীরও 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটায় সে তাহার রাজ্য বা জমিদারী বা কলকারখানা বা ধনসম্পদ, কৃষক প্রজা, শ্রমিক বা সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর খাটিয়া খাওয়া মানুষের স্বার্থে উৎসর্গ করিয়াছে বা ব্যয় করিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। সুদীর্ঘ বাহান্ন বছরে যদি একটি বিত্তবানেরও গান্ধীবাদী পন্থায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে সত্য ও অহিংসার পথে 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটান সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেশের বিত্তবান ধনিক শ্রেণীর হাজার বা লাখ মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিবে কতদিনে এবং কি ভাবে? গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা এবং দেশ বিভাগ রদ করিবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলীম লীগ নেতাদের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটাইবার জন্য বার বার আবেদন নিবেদন করিয়াও ব্যর্থতার গ্লানি লইয়া বার বার ফিরিয়া আসিয়াছেন। এমনকি তিনি তাঁহার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সহকর্মীদেরও হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাইয়া তাঁহার স্বমতে আনিয়া ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে সক্ষম হন নাই। সেই ব্যর্থতারই চূড়ান্ত পরিণতি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ এবং তাহার শোচনীয় ও করুণতায় পরিণতি ঘাতকের হাতে গান্ধীজীর মৃত্যু। অথচ শেষ মুহূর্তেও যদি গান্ধীজী ভারতের জনগনকে আহ্বান জানাইয়া বলিতেন যে, যে উপায়ে পার দেশ বিভাগে বাধা দাও, তাহা হইলে বৃটিশ স্বার্থে ও কুটচক্রান্তে পরিচালিত, কমিউনিষ্ট দল সমর্থিত সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলীম লীগের পাকিস্তানের স্বপ্ন মুহূর্তে শুন্যে মিলাইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই-কারণ গান্ধীজীর পথটিই ছিল ভুল।

১৫. এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, গান্ধীজী তাঁহার প্রথম জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকায় শেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক ইংরেজদের হিংস্র ও বর্বরতার বিরুদ্ধে তাঁহার সত্য ও অহিংস তত্ত্বের পরীক্ষা নিরীক্ষায় নামিয়াছিলেন এবং অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্জাতনও ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানকার শেতাঙ্গ বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের হিংস্র ও বর্বর হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাইতে সক্ষম হন নাই।

১৬. ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর অবদান অবিস্মরনীয়। সংগ্রামে তাঁহার কোন ক্লান্তি ছিল না। সমাজের নীচু তলার দরিদ্র ও শোষিত মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল অফুরন্ত এবং অন্তহীন। অকৃতিম দরদ লইয়াই তিনি এইসব দরিদ্র, শোষিত ও লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির জন্য বিরামহীন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পথের কারনেই

তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। তবুও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজীর মত পার্থক্যের কথা সর্বজনবিদিত। তবুও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। ১৯৪৩ সনে গান্ধীজীর জন্মদিনে, তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে যাইয়া এক বেতার ভাষনে সুভাষচন্দ্র বলেন-"১৯২০ সনে গান্ধীজী সংগ্রামের এক নূতন অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে না এলে আজও পর্যন্ত ভারত তেমনি শক্তিহীন অবস্থায় পড়ে থাকত। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর কর্মোদ্যগ অদ্বিতীয় ও তুলনাহীন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একটি জীবনে কোন মানুষ এতখানি সাফল্য অর্জন করতে পারত না" (২৩.১.৭০ আনন্দবাজার)। ১৯৪৪ সনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত অভিযানের প্রাক মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া এক বেতার ভাষনে বলেন -"আপনি জাতির জনক, ভারতের বন্ধন মুক্তির এই পবিত্র সংগ্রামে আজ আপনার নিকট আমরা আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আপনার পথ অহিংসার পথ, আর আমাদের পথ ভিন্ন। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, আপনি জাতিকে পরিচালিত করার একমাত্র অধিকারী। আপনি জাতির নেতা-আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন" (আনন্দবাজার, ২৩.১.৬৭)।

১৭. যাহাই হউক প্রকৃতি, প্রাণিজগৎ, সমাজবিকাশ, ভাবরাজ্য বা চিন্তাজগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, ইহাদের যে কোনটির যে কোন মৌলিক পরিবর্তন বা যে কোন সার্থক নবজন্মের মূল সূত্রটি হইল 'শক্তি'। আর শক্তিকে শুধু অধিকতর শক্তিদ্বারাই জয় করা যায়। ঘুষিকে ঘুষিদ্বারা এবং তরবারিকে তরবারিদ্বারাই রোখা যায়। একটা পাথরের দেয়ালের উপর ঘুষি মারিলে হাত ভাঙ্গে। ঐ পাথরের দেয়ালটার উপর একটা আনবিক বোমা ছুড়িয়া মারিলে, শক্তিধর ঐ পাথরের দেয়ালটি মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া শুন্যে উড়িয়া যায়। আবার ঐ আনবিক বোমাটিকে সূর্যের বুকে ছুড়িয়া দিলে মহাশক্তিধর ঐ আনবিক বোমাটিও শিশুর হাতের খেলনা হইয়া সূর্যের বুকে মিলাইয়া যায়। শক্তির মোকাবিলা শুধু অধিকতর শক্তিদ্বারাই করা যায়-বিশেষ ভাবে সেই শক্তি যখন গোষ্ঠি বিশেষের করায়ত্ত হইয়া গোষ্ঠি স্বার্থে নিয়োজিত থাকে।

১৮. গান্ধীজীর সমাজবাদী চিন্তার সঙ্গে অন্যান্য সমাজবাদী চিন্তা ধারার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। অন্যান্য সমাজবাদীদের মধ্যে কিছু কিছু গড়মিল থাকিলেও তাহাদের মোটামুটি বক্তব্য হইল-বর্তমান এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে দুইটি পরস্পর বিরোধী স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেণী বর্তমান। একটি উৎপাদন ও বন্টনের উপায়গুলির ব্যক্তি মালিক বিত্তবান ধনিক শ্রেণী, অপরটি উৎপাদনে নিযুক্ত বিত্তহীন সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী। ইহাদের কখন মিলন বা সহ অবস্থান সম্ভব নয়। যে ভাবেই হউক সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়া ব্যক্তি মালিকানাধীন এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার

বই বইয়ের ঠিকানা

সমূল উচ্ছেদ ঘটাইয়া সমাজের সমস্ত ধনসম্পদ এবং উৎপাদন ও বন্টনের উপায়গুলি সমাজের যৌথ মালিকানায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে আনিয়া সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। অর্থাৎ ইহাদের মতে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা দিতে হইলে চাই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রেণী সংগ্রাম, সবল বিদ্রোহ, ধনিক শ্রেণীর সমূল উচ্ছেদ, সম্পদ এবং উৎপাদন ও বন্টনের উপর সামাজিক মালিকানা। অপর দিকে গান্ধীজীর সমাজবাদের মূল ভিত্তি হইল শান্তিপূর্ণ ভাবে সত্য ও অহিংসার পথে বিত্তবান ধনিক শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন, শ্রেণী সমন্বয়, সহ অবস্থান, ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ। গান্ধীজীর বক্তব্য হইল, রাজা-মহারাজা-জমিদার শ্রেণী বা কলকারখানার মালিক ধনিক শ্রেণী সকলেই তাহাদের নিজ নিজ বিষয় সম্পত্তি ও কলকারখানা প্রভৃতির উপর নিজ নিজ অধিকার বজায় রাখিতে পারিবে, তবে তাহাদের জানিতে হইবে যে ঐ বিষয় সম্পত্তি ও ধন সম্পদের তাহারা মালিক নয় অছি বা জিম্বাদার মাত্র। ঐ ধনসম্পদ হইতে তাহারা নিজ ভরণপোষনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ খরচা করিতে পারিবে কিন্তু অবশিষ্ট ধনসম্পদ সমাজের কল্যানের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্যগুলি তাঁহার নিজ ভাষাতেই তুলিয়া ধরিতেছি। গান্ধীজী বলেন-"নীতিগত ভাবেও রাজন্যবর্গের শাসনের উচ্ছেদ আমার মনঃপুত নয়। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রকৃত মর্ম অনুসারে তার সংস্কারে আমি বিশ্বাসী"। "জমিদারীর অবলোপ এর পরিস্কার অর্থ হল জমিদার বা তালুকদারের অধীনস্থ ভূসম্পত্তি আত্মসাৎকরন। আমি অবলোপের পক্ষে নই। জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ আমি তার ন্যায় সঙ্গত নিয়ন্ত্রন চাই"। "জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন করার জন্য রাজন্যবর্গকে নেতা অথবা বৈধ রাজা করবার জন্য তাদের সচেষ্ট হতে হবে"। "ভূমিহীন ও ভূমিবান উভয়কেই পরিবর্তিত করতে হবে"। "ধনীদের কাছেই তাদের ধনদৌলত রাখতে দেওয়া হবে। তা থেকে তাদের নিজেদের দরকারে ন্যায্যত যা লাগবে তা তারা ব্যবহার করবে এবং বাকী অংশকে সমাজের কাজে লাগাবার জন্য তারা জিম্বাদার বা অছি হিসাবে থাকবে"। "উৎপাদন, বন্টন ও লেনদেনের যন্ত্রগুলির ক্রমিক রাষ্ট্রীয়করণের দাবীও এতই অবিবেচনাপ্রসুত যে তা মেনে নেওয়া যায় না"। "রাজপুত্রের মাথা কেটে তাকে কৃষকের সমান করা যাবে না। অথবা এই শিরচ্ছেদের পন্থায় কর্মচারী ও মালিক সমান হবে না"। "হিংসাদ্বারা ভূমিবান বা পুজিপতিদের পরিবর্তিত করা যাবে না। কেবল মাত্র তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়েই তা করা সম্ভব। আমরা তাদের বলতে পারি যে বিপুল ধনসম্পদ আহরন করার অধিকার তাদের আছে, কিন্তু তা তারা খুসীমত যে কোনভাবে খরচ করতে পারবে না। তাদের নিজের ধনসম্পদের অছি হতে হবে"। "আমি সম্পুর্ণ নিশ্চিত যে হিংসা পারে না, অহিংসায় তা সম্ভব

এবং শেষ পর্যন্ত অন্যায়কারীর হৃদয় পরিবর্তনের দ্বারাই তা হবে"। "নির্ভেজাল অহিংসার পথেই আমার পদক্ষেপ। তা ব্যর্থ হতে পারে। যদি ব্যর্থ হয়ই, অহিংস পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার জন্যই তা হবে" (আমার সমাজবাদ, গান্ধীজী, পৃ-৮,৯,১৬.১১.৩৯.৮.৪.১২.২৩.২)। যদিও আক্ষরিক অর্থে 'শ্রেণী সমন্বয়' কথাটি আমরা গান্ধীজীর কোন উদ্ধৃতির মাধ্যমে এখানে উপস্থিত করিতে পারি নাই কিন্তু গান্ধীজীর বিভিন্ন উদ্ধৃতির মধ্যে 'শ্রেণী সমন্বয়ের' সুরটি খুবই সুস্পষ্ট। পূর্বেই আমরা গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার পথে 'হৃদয় পরিবর্তন' এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এবার আমরা একবার বিচার করিয়া দেখিব পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মিলন বা সহ অবস্থান সম্ভব কিনা।

১৯. বিশ্বের ইতিহাস পরস্পর বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের ইতিহাস। এই সংঘর্ষে প্রবলতর শক্তি দুর্বলতর শক্তিকে পরাজিত করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেয়। যেখানে বিপরীত স্বার্থ আছে, সেখানে সংঘর্ষও আছে। পরস্পর বিপরীত স্বার্থের কখন মিলন বা সহ অবস্থান হয় না।

২০. একটি পাত্রে কিছু জল ও আগুন রাখিলে যদি জলের শক্তি বেশী হয় অর্থাৎ জলের পরিমানগত আধিক্য থাকে তবে আগুন নিভিয়া যাইবে, কিন্তু পাত্রে কিছু জল থাকিয়া যাইবে। যদি আগুনের পরিমান অর্থাৎ শক্তি বেশী হয়, তবে জলটুকু শুকাইয়া যাইবে, কিন্তু আগুন থাকিয়া যাইবে। যে হেতু আগুন ও জল পরস্পর বিপরীত গুণসম্পন্ন শক্তি তাই তাহাদের মিলন বা সহ অবস্থান সম্ভব নয়। প্রতিটি প্রাণিদেহেই একটা প্রতিরোধী শক্তি থাকে, যে সব সময় বাহিরের রোগ বীজানুর আক্রমণ হইতে প্রাণীদের রক্ষা করে। কিন্তু প্রাণীদেহের প্রতিরোধ শক্তি হইতেও অধিকতর শক্তি সম্পন্ন কোন রোগ বীজানু যদি প্রাণিদেহে প্রবেশ করে, তবে প্রাণীটি অসুস্থ হইয়া পড়ে। আবার অসুস্থ প্রাণীটির আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধী শক্তি যদি আক্রমণকারী রোগ বীজানু হইতেও অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে, তবে তাহার পাল্টা আক্রমণে ঐ রোগ বীজানুগুলি ধ্বংশ হইয়া যায় এবং অসুস্থ প্রাণীটি আবার সুস্থ হইয়া উঠে। অন্যথায় অসুস্থ প্রাণীটির মৃত্যু ঘটে এই সব ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সমূহ হইতেও আমরা এই শিক্ষাই পাই যে দুই বিপরীত স্বার্থ বা শক্তির কখনও মিলন বা সহ অবস্থান সম্ভব নয়। কারন একের ধ্বংশের উপর অপরের অস্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। যেখানে বিপরীত শক্তি বা স্বার্থের সমাবেশ ঘটে, সেখানে সংঘর্ষও অনিবার্য হইয়া উঠে। আর সেই সংঘর্ষে প্রবলতর শক্তি দুর্বলতর শক্তিকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হয়।

২১. সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। প্রতিটি রাষ্ট্র ব্যবস্থাই

বই বইয়ের ঠিকানা

১. দেশের রাজনৈতিক আকাশে, আজ মার্কসবাদীদেরই প্রভাব ও দাপট বেশী, তাই এবার আমরা মার্কসবাদী তত্ত্ব লইয়া আলোচনায় অগ্রসর হইব।

২. মার্কসবাদ। মার্কসবাদ কথাটি বহুল প্রচারিত এবং খুবই সুউচ্চরিত। একমাত্র মার্কসীয় মতবাদের মধ্য দিয়াই নাকি মানুষের সমস্ত প্রয়োজনের মীমাংসা হইতে পারে। মানুষের প্রতিটি প্রয়োজন মিটুক, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আসুক একমাত্র উন্মাদ ছাড়া মনে হয় আর সকলেই এটা চান। মার্কসবাদ ভাল কি মন্দ, ত্রুটিপূর্ণ কি অভ্রান্ত, যুগপ্রবর্তক এক মহাপন্ডিত চিন্তানায়কের মতবাদ লইয়া সেই বিচারে বসিবার মত ধৃষ্টতা আমাদের নেই। পন্ডিতজন যাঁহারা, সুধীজন যাঁহারা, তাঁহারাই সেই আলোচনা করুন। আমরা শুধু দেখিতে চাই, মার্কসবাদকে চির অভ্রান্ত এক অখণ্ড সত্যরূপে ধরিয়া লইলেও, দেশের বর্তমান পারিপার্শ্বিকতার বিচারে তাহার সফল ও পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন সম্ভব কিনা।

৩. মার্কসবাদ কি? মার্কসবাদ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন। মার্কসবাদ একটি বস্তুবাদী জীবন-দর্শন-একটি বিশ্বদর্শন। এই মতবাদের প্রবর্তক কাল মার্কসের নামানুসারে এই মতবাদকে মার্কসবাদ বলা হয়। মার্কসবাদে দার্শনিক নাম হইল—'দ্বন্দ্ব মূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'। উদ্ধৃতি "মার্কস ও এঙ্গেলস এক বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করেন, তার দার্শনিক ভিত্তি হল-দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" (মার্কসবাদ, থিওদোর ওইজেরমান, পৃ-৪৯)।

৪. মার্কস জন্ম নেওয়ার পূর্বে বা পরে পৃথিবীতে যত দার্শনিক জন্ম নিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির আদি কারন এক 'ঐশী শক্তি' বা 'চিরন্তন চিন্তা'। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ীই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি, প্রাণিজগৎ, মানবসমাজ ও তাহার রাষ্ট্রিক পরিবর্তন প্রভৃতি সব কিছুই সেই ঐশীপুরুষের মনন শক্তির ক্রিয়া প্রক্রিয়ারই ফল। সমাজে ও রাষ্ট্রে যখন অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের প্রাবল্য দেখা দেয়, তখন তিনিই তাঁহার কোনও প্রেরিতপুরুষ মারফৎ বা নিজে অবতার রূপে জন্ম লইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়া যান। প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন পরিবর্তনের মূলেও আছে তাঁহারই ঐচ্ছিক ক্রিয়া। ইহাই হইল ভাববাদী দার্শনিকদের মোটামুটি বক্তব্য।

৫. মার্কসীয় মতবাদ ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। মার্কস কোন চিরন্তন চিন্তা বা ঐশীশক্তিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, বস্তু—গতিশীল বস্তু এবং দ্বান্দ্বিক কারণ ও পদ্ধতিতে তাহার বিকাশই বিশ্বজগতের মূল রহস্য। এই বিশ্বজগতের কোন স্রষ্টা নেই।

এ চিরন্তন। এ ছিল-এ আছে-এ থাকবে। এ অনাদি-এ অনন্ত। এই বিশ্বজগৎ চিরচঞ্চল, চির-পরিবর্তনশীল, চির-প্রবাহমান, অবিচ্ছিন্ন এক অনন্ত স্রোতধারা। মার্কসীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মার্শাল স্ট্যালিন বলেন-"মার্কসবাদী দার্শনিক বস্তুবাদ; ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ন বিরোধী।" "জগৎ এক 'পরমাত্মার' বা 'বিশ্বআত্মার' মূর্তরূপ—এই ধরনের ভাববাদী কল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী হল মার্কসবাদী বস্তুবাদ"। "মার্কসবাদী বস্তুবাদ বলে যে, জগতের প্রকৃতি স্বভাবতই বস্তুগত তার প্রকাশ বৈচিত্র্য বস্তুর বিভিন্ন গতিশীল রূপ ছাড়া কিছুই নয়।" "বিশ্বপ্রকৃতি স্থানু বা অনড় নয়, অচঞ্চল বা সনাতনও নয়। বিশ্বপ্রকৃতি অবিরাম পরিবর্তনশীল ও গতিশীল"। ডামলেকটিকস্ অব নেচার পুস্তকে এঙ্গেলস বলেন-"ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম বস্তু - একটি বালুকনা থেকে সূর্য অবধি, আদিম প্রানকোষ থেকে মানুষ পর্যন্ত-সমগ্র প্রকৃতিই প্রতিনিয়ত আবির্ভূত ও তিরোহিত হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে সকল বস্তুই নিরবচ্ছিন্ন গতি ও রূপান্তরের অবস্থায় রয়েছে" (দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, পৃ-১৩,৬)। মার্কসের মতে বিরোধই হইল বিকাশের মূল সূত্র। তাঁহার মতে প্রতিটি বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরে তাহার জন্মলগ্নেই সংযুক্ত থাকে বিপরীত ধর্মী দুইটি বিরোধী শক্তির। বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীন এই বিরোধী শক্তি অবিরত সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ধীর ও ক্রমগতিতে বিবর্ত্তিত হইতে হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া আগাইয়া চলে এবং উপযুক্ত মুহূর্তে হঠাৎ এক আবর্তনের মাধ্যমে নূতনরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। এইভাবে প্রতিটি বিষয়বস্তু আংশিক অর্থাৎ পরিমানগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া মৌলিক অর্থাৎ গুনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নূতন বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। বিশ্বজগৎ এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে হইতে আগাইয়া অর্থাৎ বিকশিত হইয়া চলিয়াছে। 'মত-বিরোধ-ও সমাধান' ইহাই হইল বিকাশের সাধারন ধারা বা মূল সূত্র। সংক্ষেপে ইহাই হইল মার্কসের বিখ্যাত দ্বান্দ্বিকতত্ত্ব। ইহারই উপর দাড়াইয়া আছে সমগ্র মার্কসীয় দর্শন। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লেনিন বলেন — "বিপরীতের সংঘাতই হইল বিকাশ"। "প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুপ্রকৃতির মর্মমূলে অন্তর্নিহিত বিরোধের আলোচনাই হচ্ছে দ্বন্দ্বতত্ত্ব"। স্ট্যালিন বলেন-"এই দ্বন্দ্বতত্ত্ব বিশ্বাস করে যে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তু ও ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই নিহিত আছে স্ববিরোধ। এই বিরোধই হল ক্রমবিকাশের ধারার অন্তর্নিহিত সারকথা, পরিমানগত পরিবর্তনের, গুনগত মৌলিক রূপান্তরের অন্তর্নিহিত সারবস্তু" (দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, স্ট্যালিন, পৃ-১০,৯)। মার্কস তাঁহার এই দ্বান্দ্বিকতত্ত্ব দ্বারাই প্রকৃতি ও সমাজ বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

৬. প্রকৃতি বিশ্লেষনেও মার্কস তাঁহার এই দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের প্রয়োগ করেন। মার্কসীয় তত্ত্ব মতে গতিশীল বস্তুর বিভিন্ন সমাবেশ এবং দ্বান্দ্বিক কারনে তাহার আভ্যন্তরীন

বই বইয়ের ঠিকানা

বিরোধী শক্তির সংঘর্ষের ইতিহাসই বস্তুময় এই বিশ্বজগতের ইতিহাস। এই বিশ্বজগৎ চিরন্তন এক অনাদি অতীত হইতে অবিরাম গতিবেগে অলঙ্ঘনীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অবিরত পরিবর্তিত হইতে হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে সীমাহীন এক অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে। [এই বিরামহীন চলার পথের কোনও এক সুদূর অতীতে সৃষ্টি হয় এই বস্তুময় পৃথিবীর। ক্রমবিবর্তিত চলমান পৃথিবীর গতিপথের কোনও এক বিশেষ অনুকুল পরিবেশে বস্তুর আভ্যন্তরীন দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া পৃথিবীতে জীবনের লক্ষন প্রকাশ পায়। সৃষ্টি হয় প্রথম জীব। এই আদি জীবই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিবর্তনের ধারা বহিয়া জীব-জগতের শ্রেষ্ট জীব মানুষে রূপান্তরিত হয়। অ্যান্টি সুরিং পুস্তকে এঙ্গেলস বলেন, "প্রকৃতিই দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের প্রমান স্থল। আজকের এই জীবজগতে সবকিছুই গাছপালা, জীবজন্তু এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষও কোটি কোটি বৎসর ব্যাপী ক্রমবিকাশের ফল" (দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, স্ট্যালিন, পৃ-৭)]। ইহাই হইল মার্কসের প্রকৃতি তত্ত্ব। ইহাকেই বলা হয়-'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'। মার্কসীয় 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের' ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া স্ট্যালিন বলেন-"একে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয়, কারণ বস্তু জগতের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুজগতের ঘটনা-প্রবাহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি হল দ্বন্দ্বমূলক; আর বস্তুজগতের ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা, সেই সম্পর্কে এর ধারনা এবং এর তত্ত্ব হল বস্তুবাদী" (দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, পৃ-৩)।

৭. সমাজ বিকাশের ধারা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও মার্কস তাঁহার এই দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের প্রয়োগ করেন। মার্কসীয় তত্ত্ব মতে মানবজীবনের প্রথম যুগে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এক যৌথ পরিবেশে বাস করিত, যাহা আদিম সাম্যবাদী সমাজ নামে পরিচিত। কথিত আছে আদিম সাম্যবাদী যৌথ সমাজব্যবস্থায় মানুষে মানুষে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না। সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব ছিল না। সমাজের প্রতিটি মানুষ সেখানে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য মত যৌথ উদ্যোগে সমাজের জন্য কাজ করিত এবং তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত খাদ্যসামগ্রী বা উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ সমাজের যৌথ ভাণ্ডারে জমা করিয়া দিত। বিনিময়ে সমাজ প্রয়োজন ভিত্তিক সমবন্টনের নীতিতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের ভরণপোষনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করিত। কালক্রমে সমাজ বিকাশের পথে মানবজাতির এই আদিম সাম্যবাদী যৌথ-সমাজব্যবস্থা একদিন ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেখা দেয় পরস্পর বিরোধী স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেণীবিভক্ত নূতন সমাজব্যবস্থা। এঙ্গেলস বলেন-"আদি গোষ্ঠীগুলি ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন এবং শেষ পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে' (কমিউনিষ্ট ইশতেহার, মার্কস ও এঙ্গেলস, পৃ-৩৪)। মানবসমাজের এই প্রথম শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে বলা হয় 'দাস সমাজ'। মার্কসীয়তত্ত্ব মতে সমাজ বিকাশ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতত্ত্ব প্রকাশ পায় শ্রেণী

সংঘর্ষের অর্থাৎ 'শ্রেণী সংগ্রামের' ভিতর দিয়া। শ্রেণী বিভক্ত নূতন সমাজ তাহার পথ পরিক্রমার পথে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়া বিবর্তিত ও আবর্তিত হইতে হইতে-'দাসসমাজ' ও 'সামন্ত সমাজব্যবস্থা' অতিক্রম করিয়া বর্তমানে আসিয়া 'ধনতান্ত্রিক সমাজ' জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। 'ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা' ও শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত একদল মুষ্টিমেয় মানুষ ছলে বলে ও নানা কৌশলে ধীরে ধীরে উৎপাদনে সব রকমের সব উপাদান বা হাতিয়ারগুলি দখল করিয়া লইয়া তাহার উপর নিজেদের ব্যক্তিগত স্বত্ব কায়েম করিয়া বসে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সেই অধিকার তাহারা ভোগ করিতে থাকে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা হইতেই শ্রেণী বিভক্ত সমাজের উৎপত্তি। ব্যক্তিগত স্বত্ত্বে স্বত্ববান শ্রেণীর মানুষগুলি তাহাদের নিজ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগিদে রাষ্ট্রের জন্ম দেয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় সমাজের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করিয়া চলে। লেনিন বলেন-"সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে সমাজ যখন পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সমাজের উর্দ্ধে দাড়ান, সমাজ থেকে কিছুটা পৃথক সত্বা বিশিষ্ট একটি কর্তৃপক্ষ ছাড়া সমাজ যখন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারছিল না, তখনই হিংসার সংগঠিত রূপ রাষ্ট্র অপরিহার্য ভাবে দেখা দেয়" (কার্লমার্কস, লেনিন, পৃ-৫২,৫৩)। মার্কস ও এঙ্গেলস বলেন, "রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শক্তি মাত্র" (কমিউনিষ্ট ইশতেহার, পৃ-৫৯)। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের দল উৎপাদনের উপায়গুলির অধিকার হারাইয়া ঐ উৎপাদন ব্যবস্থার অধীনেই কাজ করিতে বাধ্য হয় এবং নিজ শ্রমে উৎপাদিত বা সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদক সংস্থার অধিকারী মালিক শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দিয়া নিজ শ্রমলব্ধ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া ঐ প্রভুশ্রেণীর অনুগ্রহে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক লইয়া কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে পরিস্কার দুইটি পরস্পর বিরোধী স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একটি সংখ্যালঘু বিত্তবান শ্রেণী, অপরটি বিত্তহীন সংখ্যাগরিষ্ট খাটিয়া খাওয়া মানুষের শ্রেণী। একটি বঞ্চক শ্রেণী, অপরটি বঞ্চিত শ্রেণী। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুগের বঞ্চিত মানুষের দল বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ করিয়া তৎকালীন অন্যায় ও অবিচারমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পাল্টাইয়া দিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু বঞ্চনামূলক সমাজব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রে নূতন বঞ্চনা কৌশলের অধীনে তাহারা আবার বাঁধা পড়িয়া যায়। কমিউনিষ্ট ইশতেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেন-"সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে, এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নূতন শ্রেণী, অত্যাচারের নূতন অবস্থা" (পৃ-৩৫)। পরস্পর

বই বইয়ের ঠিকানা

বিরোধী স্বার্থের সংঘাতের মধ্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার এই যে পরিবর্তন ঘটে, মার্কস 'দ্বান্দ্বিক কারণে' 'শ্রেণী-সংগ্রাম'ই তাহার মূল কারন বলিয়া মনে করেন। পরস্পর বিরোধী স্বার্থবিশিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার লড়াইকেই বলা হয় 'শ্রেণী সংগ্রাম'। মার্কসের মতে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংগ্রামই সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের মূলকথা। সমাজ বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া এমিল বার্নস তাঁহার মার্কসবাদ পুস্তকে বলেন- ''ইতিহাসের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী দৃষ্টি অনুযায়ী পরস্পর বিরোধী শ্রেণীগুলির দ্বন্দ্বই হইতেছে সমাজ বিকাশের প্রধান চালকশক্তি'' (মার্কসবাদ, পৃ-১১)। যতদিন সমাজব্যবস্থা হইতে শ্রেণী বিভাগ লোপ না পাইবে, ততদিন সমাজ ও রাষ্ট্রে কোন স্থায়ী শান্তি আসিতে পারিবে না-সংঘর্ষ চলিতেই থাকিবে। কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে এঙ্গেলস বলেন- ''জমির উপর আদিম যৌথ-সমাজব্যবস্থার বিলোপের পর থেকে মানব জাতির ইতিহাস শ্রেণী সংঘর্ষের ইতিহাস।.....আজ এই শ্রেণীসংগ্রাম এমন পর্যায় এসেছে যে এখন শোষিত ও অত্যাচারিত সর্বহারা শ্রেণী শুধু নিজেকে শোষক ও অত্যাচারী বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না, মুক্তি পেতে হলে সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য সমগ্র সমাজকেই শোষন, অত্যাচার ও শ্রেণী সংগ্রামের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে'' (দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, স্ট্যালিন, পৃ-৩৯)। বর্তমানে আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধীনে বাস করিতেছি। শ্রেনী বিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেও তাই স্বভাবতই শ্রেনী বিরোধ বর্তমান। ধনবাদী সমাজে এই বিরোধ হইল উৎপাদনের উপাদানগুলির অধিকারী শিল্পপতি ধনিক শ্রেনীর সঙ্গে শিল্প কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক শ্রেনীর। শিল্পপতি ধনিক শ্রেনী উৎপাদনে অংশ না লইয়া অর্থাৎ কোন শ্রম না দিয়াও শ্রমিক শ্রেনীর শ্রমে উৎপন্ন পন্যসামগ্রীর অধিকারী হইয়া বসে। আর শিল্পকর্মে শ্রমরত শ্রমিক শ্রেনী, উৎপাদনে অংশ লইয়া এবং নিজ শ্রমে পন্য সামগ্রী উৎপন্ন করিয়াও তাহার ফলের অধিকার পায় না। ধনবাদী সমাজব্যবস্থার বিরোধ এইখানে। শিল্পকর্মে নিয়োজিত এই শ্রমিক শ্রেনীকেই মার্কস 'সর্বহারা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই 'সর্বহারা শ্রেনী' সম্বন্ধে আমাদের অনেকের কিছুটা ভুল ধারনা আছে। সাধারনত আমরা কলকারখানায় বা ক্ষেত খামারে কর্মরত দরিদ্র শ্রেনীর মানুষকেই সর্বহারা রূপে গন্য করিয়া থাকি। কিন্তু এটা ঠিক নয়। মার্কস কথিত এই 'সর্বহারা শ্রনী'র উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এঙ্গেলস বলেন-''দরিদ্র লোক ও মজুর শ্রেনী সর্বদাই রহিয়াছে এবং মজুর শ্রেনী সমূহ বরাবর খুবই দরিদ্র কিন্তু আমাদের চারিপার্শ্বে যেরূপ দরিদ্র মজুর দেখা যায় এই সর্বহারাদল সর্বদা বিদ্যমান ছিল না''। ''অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংল্যাণ্ডে যে শিল্প বিপ্লব হইয়াছিল তাহার ফলেই সর্বহারা শ্রেনী জন্মলাভ করিয়াছিল এবং তখন হইতে প্রত্যেক সভ্যদেশে ইহার পুনরাভিনয় হইয়া আসিতেছে'' (কমিউনিজম,

আবদুল হালিম, পৃ-১৮)। মার্কসরে মতে ঐ একই দ্বান্দ্বিক কারনে শ্রেনী সংঘর্ষের মধ্য দিয়া বর্তমানের শ্রেনী বিভক্ত এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সর্বহারা শ্রমিক শ্রেনীর নেতৃত্বে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ ঘটিয়া সর্বহারার শ্রেনীর একনায়কত্বে গোটা সমাজের যৌথ মালিকানা ভিত্তিক একটি নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। এই নূতন সামাজিক রাষ্ট্রকেই বলা হয়-'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' (ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী কালে বিস্তারিত আলোচনা করিব)। এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মার্কসের শেষ আশা- 'সাম্যবাদী সমাজ' গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেককেই শ্রম দিতে অর্থাৎ কাজ করিতে হয়। কাজ সেখানে বাধ্যতামূলক। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া স্ট্যালিন বলেন-''প্রত্যেকে দেবে অর্থাৎ কাজ করবে তার সামর্থ অনুযায়ী এবং প্রত্যেকে পাবে তার কাজ অনুযায়ী''। ''যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না''। (মার্কসবাদ, সোভিয়েত প্রকাশনী, পৃ-৮; দ্বান্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, স্ট্যালিন, পৃ-৩৭)। অর্থাৎ যে যেমন পরিশ্রম করিবে তাহাকে সেই মত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। মার্কসের মতে সারা পৃতিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই একদিন ঐ একই পদ্ধতিতে শ্রেনী সংগ্রামের ভেতর দিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। মার্কসের স্বপ্ন, এই সর্বশেষ শ্রেনী শাসিত রাষ্ট্র অর্থাৎ সর্বহারার শ্রেনীর একনায়কত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাহির হইয়া একশুভদিনে, অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে তাহার দেহ, ও মন হইতে শ্রেনী ও রাষ্ট্র যন্ত্রটিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবে, সৃষ্টি হইবে এক নূতন সমাজ ও সভ্যতার। সৃষ্টি হইবে গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের এক অখণ্ড স্বাধীন সুখী মানব সত্বার। সেখানে কোন শ্রেনী থাকিবে না, কোন রাষ্ট্র থাকিবে না, কোন শাসন থাকিবে না, কোন শোষণ থাকিবে না। স্বাধীন সুখী সচেতন মানুষ সেখানে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য মত শ্রম দিয়া নিজ নিজ সামাজিক প্রয়োজনে সমষ্টিগত ভাবে ভোগ্যবস্তু সমূহ উৎপাদন করিবে এবং প্রতিটি মানুষ নিজ প্রয়োজন মত প্রতিটি ভোগ্যবস্তু পাইবে এবং আপন ইচ্ছায় তাহা ভোগ করিবে। তারপর চির অপরাজিত মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে আগাইয়া যাইবে। ইহাই হইল মার্কসবাদের চরম লক্ষ্য বা শেষ কথা। এইভাবেই মার্কস সমাজ বিকাশের গতি নির্ধারন করিয়াছেন। লেনিন বলেন-''সমাজতন্ত্র শ্রেনী বিলোপের পথে অগ্রসর হয়ে, রাষ্ট্র বিলোপের পথ রচনা করবে'' (কার্ল মার্কস, লেনিন, পৃ-৫৩)। এ্যান্টি সুরিং গ্রন্থে এঙ্গেলস বলেন-''প্রথমে রাষ্ট্র সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি রূপে এগিয়ে এসে সমাজের নামে উৎপাদনের উপকরনগুলি দখল করে এটাই হল রাষ্ট্র হিসেবে উহার সর্বশেষ স্বাধীন কর্ম। অতঃপর সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব একের পর এক নিষ্প্রয়োজন

বই বইয়ের ঠিকানা

হয়ে পড়বে এবং পরিশেষে নিজ অস্তিত্বেরই অবসান ঘটবে। .....রাষ্ট্রে বিলোপ ঘটান হবে না—রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর সমাজ স্বাধীন ও সাম্য ভিত্তিক উৎপাদক সঙ্ঘদ্বারা উৎপাদন সংগঠিত করবে" (কার্ল মার্কস, লেনিন, পৃ-৫৩,৫৪)। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রয়োগে সমাজ বিকাশের ধারা বিশ্লেষণকেই বলা হয়-ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। স্ট্যালিন বলেন-"সমাজজীবনের অনুশীলনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলনীতিগুলোর প্রয়োগকেই বলা হয়-ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" (দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, স্ট্যালিন, পৃ-৩)।

৮. সংক্ষেপে ইহাই হইল মার্কসবাদের মূল বক্তব্য-অর্থাৎ মার্কসবাদ। এবার আমরা বিচার করিয়া দেখিব, খাঁটী মার্কসীয় শিক্ষা লইয়া বা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগে কোনও দল বা রাষ্ট্র চলিতেছে কিনা বা বর্তমান বাস্তব অবস্থার বিচারে চলা সম্ভব কিনা।

৯. মার্কসীয়তত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃতি, ব্যক্তিজীবন, সমাজবিকাশ বা রাষ্ট্র বিপ্লব, ইহার যে কোনটির যে কোন পরিবর্তনের মূলে আছে একমাত্র দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া। সেখানে ভগবান, ঐশীশক্তি, চিরন্তন চিন্তা বা ঐ ধরনের কোন কিছুরই কোন স্থান নেই। কাজেই কোন ব্যক্তি, দল বা রাষ্ট্রকে মার্কসবাদী বা কমিউনিষ্ট বলিয়া দাবী করিতে হইলে, তাহার প্রথম শর্ত তাহাকে অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী হইতে হইবে এবং সেই অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে।

১০. আজ পঞ্চান্ন বছর রাশিয়ায় মার্কসবাদী বলশেভিক দলের নেতৃত্বে বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, চীন, উত্তর ভিয়েৎনাম, কিউবা প্রভৃতি রাষ্ট্রেও বিভিন্ন মার্কসবাদী দলের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি আধা-স্বাধীন রাষ্ট্রও আছে, যাহারা নিজেদের মার্কসবাদী বা কমিউনিষ্ট বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। এই সব দেশের কর্তৃত্ব মার্কসবাদী বা কমিউনিষ্টদের হাতে আসিয়াছে আজ তের হইতে পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে। কিন্তু এইসব দেশে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীতত্ত্ব ভিত্তিক কোন আন্দোলন গড়িয়া তোলা হইয়াছে বা ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হইয়াছে বা এইসব দেশ নিরীশ্বরবাদের দিকে একপাও অগ্রসর হইয়াছে এমন কথা শোনা যায় না। সেখানে আজও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বহু'উপাসনালয় আছে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষ দলে দলে সেখানে নিয়মিত যাতায়াতও করিয়া থাকে। মার্কসীয় তত্ত্বমতে অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস অচলায়তনের মত দাঁড়াইয়া মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তাহার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ধর্মীয় অনুশাসনের এই কৃত্রিম বেড়াজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মানুষকে মুক্ত করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু হইয়াছে কি? আমাদের দেশেও বহু মার্কসবাদী দল আছে এবং তাহাদের সভ্য সংখ্যাও প্রচুর। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু

সভ্যের কথা বাদ দিলে দলের অধিকাংশ সভ্যই ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্য কিছু। কিন্তু প্রশ্ন হইল একজন হিন্দু বা একজন মুসলমান একজন মার্কসবাদী অর্থাৎ কমিউনিষ্ট হইতে পারে কি? বা একজন মার্কসবাদী অর্থাৎ কমিউনিষ্ট কি একজন শিখ, বৌদ্ধ বা অন্যকিছু হইতে পারে? না। একজন মার্কসবাদীকে শুধু একজন মার্কসবাদীই হইতে হইবে—অন্যকিছু হওয়া যায় না। লোক সভার সদস্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নেতা এ.কে. গোপালন বলেন-"যেসব মার্কসবাদী মন্দিরে যায় তারা মার্কসবাদীও নয় কমিউনিষ্টও নয়। মার্কসবাদ আর দেব পূজা একসঙ্গে চলতে পারে না" (যুগান্তর, ৮.৭.৭২) একজন মুসলমান যদি মসজিদে কোন মূর্তি রাখে বা তাহার পূজা দিতে যায়, তবে সেই মুহূর্তেই সে ইসলাম ধর্মচ্যুত হইবে। কারন ইসলামের মৌলিক শর্ত সে মূর্তি পূজা স্বীকার করে না। কোনও স্থপতিকে যদি একখানা কুড়ে ঘরও তৈরী করিতে দেওয়া হয়, তবে তাহার প্রথম শর্ত হইবে ঐ স্থপতিকে একখণ্ড জমি দিতে হইবে, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ঐ স্থপতিকে কুড়ে ঘর বা রাজপ্রাসাদ গড়িতে হইবে। জমি না হইলে বিশ্বশ্রেষ্ঠ স্থপতির পক্ষে একখানা কুড়ে ঘরও প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। মার্কসবাদের জমিন অর্থাৎ মৌলিক ভিত্তি হইল-'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'। যাহার উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে গোটা মার্কসীয় দর্শন। কাজেই কোন ব্যক্তি, দল বা রাষ্ট্রকে মার্কসবাদী বলিয়া দাবী করিতে হইলে প্রাথমিক শর্ত হিসাবে তাহাকে অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী হইতে হইবে এবং সর্ববিষয়ে সেই অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে। মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বিচারে তাই আমাদের মতে বর্তমানে কোন রাষ্ট্রকে বা আমাদের দেশের কোন দলকেই মার্কসবাদী বা কমিউনিষ্ট বলা চলে না। কারণ মার্কসবাদের মূল ভিত্তি 'নিরীশ্বরবাদ' বা 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী' তত্ত্ব ভিত্তিক কোন দল বা রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই।

মার্কসের স্বপ্ন বা মার্কসবাদের শেষ সিদ্ধান্ত সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শ্রেনী ও রাষ্ট্রহীন এক অখণ্ড সাম্যবাদী সমাজ গঠন। যেখানে শাসন ও শোষনমুক্ত স্বাধীন সুখী মানুষ সামাজিক ভাবে আপন প্রয়োজনে পন্য, ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করিবে, আপন প্রয়োজন মত তাহা পাইবে এবং আপন ইচ্ছামত তাহা ভোগ করিবে। বলা হয় আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোন শ্রেনী বিভাগ ছিল না, তাই সেখানে মানুষে মানুষে কোন সংঘর্ষও ছিল না। পরস্পর বিরোধী স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেনীবিভক্ত সমাজব্যবস্থাই মানুষে মানুষে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষের সূচনা করে। মার্কস তাই মনে করেন, মানবসমাজে স্থায়ী শান্তি আনতে হইলে, এই শ্রেনী বিভক্ত সমাজব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া গোটা মানবজাতিকে একটি অখণ্ড সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাধিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাই হইল শ্রেনী ও রাষ্ট্রহীন সমাজগঠনের মূল বক্তব্য।

বই বইয়ের ঠিকানা

মার্কসের এই স্বপ্ন কল্পিত সুন্দর সাম্যবাদী মানবসমাজ পৃথিবীতে কবে আসিবে বা আদৌ আসিবে কিনা কার্ল মার্কসের প্রায় একশত বছর পর বা রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চুয়ান্ন বছর পরেও বর্তমান পৃথিবীর কোন মার্কসবাদীর পক্ষেই তাহা বলা সম্ভব নয়। সর্বহারা একনায়কত্বে পরিচালিত বর্তমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে সুদৃঢ় ভবিষ্যতেও পৃথিবীতে অখণ্ড মানবজাতির শ্রেনী ও রাষ্ট্রহীন এক সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন প্রশ্নাতীত নয়। বর্তমান পৃথিবীতে যে কয়েকটি একনায়ক শাসিত স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আছে তাহাদের প্রায় কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নেই। প্রত্যেকেই অপরকে শোধনবাদী, নয়া-শোধনবাদী, অতিবিপ্লবী হঠকারী, বামপন্থী ক্ষ্যাপামী বা অপর কোনও না কোনও ভাষায় গালাগালি দিয়া পরস্পরের দিকে পেছন ফিরিয়া ঘোমটা টানিয়া বসিয়া আছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইসব একনায়কদের নিজেদের আসন চিরস্থায়ী করিবার জন্য সংবিধানে বিধান পর্যন্ত করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও বা নিজেদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবার ঝোঁকও দেখা যাইতেছে। যদিও এই সবকিছুই মার্কসীয় চিন্তাধারার সম্পুর্ন পরিপন্থী। এই চরিত্র লইয়া যেদিন পৃথিবীর দেড়শতটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দেড়শতটি একনায়ক সৃষ্টি হইবে, তখন তাঁহার স্বেচ্ছায় নিজ নিজ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া শ্রেণী ও রাষ্ট্রহীন এক অখণ্ড সমাজ কায়েম করিতে লাগিয়া যাইবে আজকের দিনে অন্তত এটা একটা অলীক কল্পনা ছাড়া অন্য কিছুই ভাবা যায় না। তবুও কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা একদিন পৃথিবীতে কায়েম হইবেই ধরিয়া লইলেও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে বর্তমানে সেই সম্ভাবনা আছে কিনা। কমিউনিজম বিশ্বমানবের শ্রেণী ও রাষ্ট্রহীন এক অখণ্ড সমাজব্যবস্থা। এই কোন দেশবিশেষে, কমিউনিজমের প্রতিষ্টা বা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। মার্কসীয়তত্ত্ব মতে রাষ্ট্র মানেই শ্রেণী শাসন। রাষ্ট্র হইল উৎপাদনের উপায়গুলির অধিকারী শ্রেণীর হাতের একটি যন্ত্র যাহার সাহায্যে সে তাহার শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলে। এক কথায় রাষ্ট্র মানেই হইল শ্রেণী শাসন আর কমিউনিজম হইল শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা। শ্রেণী শাসন না থাকিলে রাষ্ট্রও থাকিতে পারে না, আর রাষ্ট্র থাকিলে শ্রেণী শাসন থাকিতেই হইবে। অনেক মার্কসবাদী বলিয়া থাকেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণীহীন সমাজ কায়েম হইয়াছে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে একখানি কমিউনিষ্ট পুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতেছি-"বর্তমান সাম্যপন্থী রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে উহাও শ্রেণী শাসন মাত্র" (কমিউনিজম, অমূল্য অধিকারী, পৃ-৬৫)। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে-কমিউনিজম যেহেতু শ্রেণীহীন সমাজ, আর রাষ্ট্র মানেই যখন শ্রেণী শাসন, তখন কোন অবস্থাতেই কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। অন্য কারণেও কমিউনিজম অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজ কোন

একটি দেশের গন্ডির মধ্যে কায়েম করা যায় না। কারণ কমিউনিজমের লক্ষ্য মনে কোনও একটি জাতি যদি তাহার দেশকে শ্রেণী ও রাষ্ট্রহীন একটি সাম্যবাদী সমাজে পরিনত করে, তাহা হইলে সেই মুহূর্তেই তাহার চারিদিকের শ্রেণী শাসিত রাষ্ট্রগুলি তাহাকে দখল করিয়া লইবে। কারণ রাষ্ট্র যন্ত্রটি না থাকায় তাহার দেশ রক্ষার কোন ব্যবস্থাও থাকিবে না। কাজেই গোটা পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ যতদিন সাম্যবাদী সমাজ গঠনের শর্তগুলি পালন করিয়া মানষিক দিক হইতে প্রস্তুত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হইতে পারে না। একটি দেশে কমিউনিষ্ট বিপ্লব সম্ভব কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে এঙ্গেলস বলেন-"না"। "এই কমিউনিষ্ট বিপ্লব হইবে একটা বিশ্বজনীন বিপ্লব বা বিশ্ব বিপ্লব" (কমিউনিজম, আবদুল হালিম, পৃ-৪৬,৪৭)। কাজেই বর্তমানেতো নয়ই অদূর ভবিষ্যতেও কমিউনিজমের অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

১৩. আমাদের পূর্বেকার আলোচনাটাই মার্কসবাদের সব কথা নয়। মার্কসবাদের প্রথম শর্ত ও শেষ সিদ্ধান্তের মাঝে আছে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রটি। সেই ক্ষেত্রটিতে আমরা আজ বাস করিতেছি ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার অধীনে। মার্কসীয় শিক্ষামতে ধনতান্ত্রিক যুগের সমাজ সচেতন মানুষ আমরা আমাদের উপর শুধু এই ঐতিহাসিক দায়িত্বটুকু বর্তাইয়াছে যে, সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ ঘটাইয়া সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন করা। কিন্তু মুস্কিল বাধিয়াছে বিপ্লবের রূপ কৌশল ও প্রয়োগ পদ্ধতি লইয়া। আজ পর্যন্ত যে কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইয়াছে, সেইসব দেশের বিপ্লবের কলাকৌশল লইয়া কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল হয় নাই। এই সম্বন্ধে মার্কসের নিজস্ব ধ্যান-ধারনাও সফল হয় নাই। মার্কসীয় তত্ত্বমতে অপেক্ষাকৃত উন্নত শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হইবে, পরে সেই বিপ্লব ধীরে ধীরে অন্যান্য শিল্পোন্নত শিল্প প্রদান রাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িবে। কোথায় এই বিপ্লব প্রথম সংঘটিত হইবে? এঙ্গেলস বলেন-"দেশ বিশেষের উৎকৃষ্ট ও উন্নততর যন্ত্রশিল্প, ব্যবসা, প্রভূত সম্পদ কিংবা বেশী পরিমান উৎপাদিকা শক্তির উপরই এই কমিউনিষ্ট বিপ্লব নির্ভর করবে" (কমিউনিজম, আবদুল হালিম, পৃ-৪৭) কে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে, কে প্রকৃত বিপ্লবী? মার্কস বলেন-"বুর্জোয়াদের মুখোমুখী যে সব শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েত (সর্বহারা) হল প্রকত বিপ্লবী শ্রেণী। .....নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছোট হস্তশিল্প কারখানার মালিক, দোকানদার, কারিগর—এরা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। বলতে গেলে- প্রতিক্রিয়াশীলও" (কমিউনিষ্ট ইশতেহার, মার্কস, এঙ্গেলস, পৃ-৪৬)। কিন্তু আজ পর্যন্ত যে কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইয়াছে

বই বইয়ের ঠিকানা

তাহাদের মধ্যে একটিও অপেক্ষাকৃত উন্নতশীল্প প্রধান রাষ্ট্র নয়। মূলত এইসব কয়েকটি দেশই কৃষি প্রধান দেশ বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয়ত এইসব কোন দেশের বিপ্লবেই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব দেয় নাই। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্ব মতে এটা হওয়ার কথা নয়। আর মার্কস যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে একেবারেই আমল দেন নাই এবং দোদুল্যমান অস্থির চিত্ত বলিয়া অপাঙক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটি হইতেই প্রতিটি বিপ্লবে নেতৃত্ব আসিয়াছে এবং প্রচণ্ড কর্মশক্তিরও পরিচয় ও তাহারা দিয়াছে। কিন্তু মার্কসবাদীরা মার্কসের কোন কথারই হেরফের দেখিতে প্রস্তুত নন। তাই ১৯১৭ সনের রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যখন তাহারা দেখিলেন যে মার্কসীয় ব্যাখ্যা মতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোন উন্নত শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রে না হইয়া, শিল্পে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র রাশিয়ায় সংঘটিত হইল। এবং সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিল সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী নয়, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, তখন তাহারা মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। ব্যাখ্যা বাহির হইয়া গেল। আবিষ্কৃত হইল দুইটি নূতন শব্দ-'ধনতন্ত্রের অসম বিকাশ' এবং 'শ্রেণীত্যাগী সর্বহারা'। মার্কসবাদীদের কৈফিয়ৎ ধনবাদী সকল দেশে সমান ধাপে অগ্রসর হয় নাই বলিয়াই প্রথম সমাজবাদী বিপ্লবে এই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আর যেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে হইবে সর্বহারা শ্রেণীকে তাই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়াছিল যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষগুলি তাহারা হইয়া গেল-'শ্রেণী ত্যাগী সর্বহারা'। এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষগুলি নাকি নিজ শ্রেণী স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সর্বহারা শ্রেণী স্বার্থকে নিজ স্বার্থজ্ঞানে ঐ বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়াছিল। কিন্তু প্রশ্ন আসে মানবজীবনের শুরু হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে মানব জাতি আজ পর্যন্ত যতগুলি সমাজব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ দাস সমাজ, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইহার কোনও একটি সমাজব্যবস্থাও কি অভঙ্গুর অবস্থায় পৃথিবীর সর্বদেশে সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল, না হইতেছে? ১৯১৭ সনে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় জার্মান, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার শিল্পোন্নতির সঙ্গে রাশিয়ায় সমহারে শিল্পোন্নয়ন ঘটে নাই একথা হয়ত ঠিক। কিন্তু এটা কি ধনতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্য? সামন্ত যুগের ভারত, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি যখন সামন্ততন্ত্রের সুউচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন পৃথিবীর সর্বত্র সকল সামন্ত রাষ্ট্রগুলি কি রুশ, চীন, ভারত প্রভৃতির সঙ্গে সমান তালে আগাইতে পারিয়াছিল? না। বরং দেখা যায় আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বহু অঞ্চলের মানুষেরা তখন গোষ্ঠী বা দাস যুগে বিচরন করিতেছিল। বর্তমান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাহার যাত্রা শুরু করে সামন্ত যুগে, কিন্তু ভূদাসের পরিবর্তে দাস মানুষকে লইয়া। সে যখন ধনতন্ত্রের পথে পা দেয়, তখনও সেখানে দাসযুগের অবসান ঘটে নাই। এঙ্গেলস বলেন-"আজ অনুন্নত ও পশ্চাদগামী কোন কোন দেশে এবং এমনকি

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিনাংশে বর্তমান সময় পর্যন্ত (১৮৪৭) তাহারা গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ" (কমিউনিজম, আবদুল হালিম, পৃ-২৩)। আজ সমাজবাদী যুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র সমাজবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলিই কি সমভাবে বিকশিত হইয়া চলিয়াছে? যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, চীন, কিউবা প্রভৃতি সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলি কি সমাজবাদী রাশিয়ার সঙ্গে সমতা অর্জন করিয়া সমভাবে আগাইতে পারিতেছে? না । অন্যদিকে দেখা যাইতেছে যে সু-উন্নত সমাজবাদী রাষ্ট্র রাশিয়া এবং সুউন্নত ধনবাদী রাষ্ট্র আমেরিকার সঙ্গে আজও সামন্ত যুগের শেষ স্মারক অতি অনুন্নত সামন্ত রাষ্ট্র মরক্কো, আবিসিনিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব প্রভৃতি এবং গোষ্ঠী, দাস ও আধাসামন্ত যুগের স্মৃতিবাহী অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আফ্রিকার গভীর অরন্যের কিছু কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর সহ অবস্থান চলিতেছে। কাজেই অসম বিকাশ ধনতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্য নয়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার কারনে কোন যুগের কোন সমাজ ব্যবস্থাই পৃথিবীর সর্বদেশে সমভাবে বিকশিত হয় নাই এবং হইতেওছে না। আর শ্রেণী ত্যাগী সর্বহারা ও বিপ্লবের নেতৃত্ব সম্বন্ধেও আমরা মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নয়। বিপ্লবের একটা লক্ষ্য আছে-একটা আদর্শ আছে। সেটা কোন একটা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থের অনেক উর্ধ্বে। বিপ্লবের লক্ষ্য গোটা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের সার্বিক কল্যাণ। শ্রেণী ত্যাগী সর্বহারাই হউক, আর সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীই হউক, তাহাদের একটা স্বার্থ আছে, সেটা তাহাদের নিজ শ্রেণীগত স্বার্থ। তাহার স্থান নিশ্চয়ই গোটা সমাজের স্বার্থের উর্ধ্বে হইতে পারে না। 'স্বার্থান্ধ' শ্রেণীই হউক আর ব্যক্তিই হউক-তাহারা কখনও আদর্শ বিপ্লবী হইতে পারে না তাহারা কখনও বিপ্লব করিতে পারে না। আদর্শ বিপ্লবীকে হইতে হইবে শ্রেণীত্যাগী সর্বহারা নয়-সর্বত্যাগী মহাফকির। বিপ্লবী যে, সে কোন শ্রেণী হইতে আসিয়াছে, সে নিজ শ্রেণী স্বার্থত্যাগ করিয়াছে কিনা, একটি আদর্শ বিপ্লবী জীবনে এসব অবান্তর প্রশ্ন।

১৪. মার্কসের সময়ে শিল্পোন্নত দেশে তিনি যে ধরনের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীকে দেখিয়া গিয়াছিলেন, পরিবর্তিত পৃথিবীর আজকের দিনে কোন উন্নত শিল্পপ্রধান দেশে সেই ধরনের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীকে খুঁজিয়া পাওয়াই দুস্কর। আর তাহাদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা বা জঙ্গী মনোভাবেরতো কোন পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছেনা। এই অবস্থায় আগামী দিনের সমাজ বিপ্লব ও তাহার নেতৃত্বও নূতন রূপ নিতে বাধ্য। কিউবার সমাজবাদী বিপ্লবের অন্যতম নেতা ও তাত্ত্বিক অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন-"নগরের অধিবাসী শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া ভাবাপন্ন হয়। আগামী দিনের সমাজবাদী বিপ্লবের নেতৃত্বের ভার ইতিহাস এ যুগে ছাত্র ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করিয়াছে" (গণবার্তা, শারদ সংখ্যা-১৩৭৫ সন, পৃ-৭৫)। এবার আমরা আমাদের দেশের

বই বইয়ের ঠিকানা

মার্কসবাদী সমাজবাদী আন্দোলনের ধারা লইয়া কিছুটা আলোচনা করিয়া দেখিব।

১৫. আমরা ভারতীয়েরা ছিলাম প্রায় সাড়ে সাতশ বছর গোলামীর শেকলে বাঁধা একটি জাতি। সেই গোলামীর উত্তরাধিকার সূত্রে নানা ভাবধারার মত মার্কসবাদ সমাজবাদও রাশিয়া হইতে লণ্ডন হইয়া রুশ-ইংরেজ জাতীয় স্বার্থগায়ে মাখিয়া ভারতের মাটিতে আসিয়া ভিত গড়িয়াছে। তাই মার্কসের মহান মানব মুক্তির মন্ত্র 'সাম্যতন্ত্র' ভারতের মাটিতে আসিয়া 'গোলামতন্ত্রে' পরিনত হইয়াছে। যতদিন একমাত্র রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল, ততদিন কিছুটা সুবিধা ছিল। তখন যাহাই ছিল স্তালিনবাদ-রুশবাদ, তাহাই ছিল মার্কসবাদ-সমাজবাদ। গোল বাঁধিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, যখন দ্বিতীয় রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হইল। তখন হইতেই মার্কসবাদ, সমাজবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা শুরু হইয়া গেল। একে একে পৃথিবীর আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে সমাজবাদী বিপ্লব সংঘটিত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর মার্কসবাদী সমাজবাদীরা বহুভাগে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক এক দল এক একটি রাষ্ট্রকে মার্কসবাদ সমাজবাদের খাঁটী ব্যাখ্যাতা ধরিয়া এবং আদর্শ গুরুত্বে বরণ করিয়া লইয়া গুরু অর্চনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল। ইহাদের বাহিরেও কয়েকটি ছোটখাট দল আছে যাহারা নিজেদের মার্কসবাদী সমাজবাদী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। ইহাদের অবস্থা আরও করুণ। ইহারা গোলামের গোলাম। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া নীতি বদলায় প্রভু বদলায়। কিন্তু দল ভাঙ্গে না-কারণ নেতৃত্ব যায়। ইহাই হইল আজকের দিনে আমাদের দেশের মার্কসবাদী সমাজবাদীদের চরিত্র। যাহার ফলে কোন সমস্যার সমাধান তো হইতেছে না, বরং সমস্যা ও সঙ্কট দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মার্কসবাদ গ্রহন করিলেই যদি আমাদের সকল সমস্যা মিটিয়া যায়, বেশ মার্কসবাদ গ্রহন করিব। কিন্তু প্রশ্ন হইল কোন রাষ্ট্রের কোন মার্কসবাদকে গ্রহণ করিব। যখনই যে কোনও একটি মার্কসবাদী রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিয়া চলিতে শুরু করিব, তখনই অপর মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলি চিৎকার শুরু করিয়া দেবে-শোধনবাদী, নয়া-শোধনবাদী বা হঠকারী -অতিবিপ্লবী প্রভৃতি বলিয়া। বিদেশ ছাড়িয়া ঘরমুখী হইব? সেখানে সমস্যা আরও জটিল। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট অখণ্ড ভারতে মার্কসবাদী দলের সংখ্যা ছিল গোটা চার-পাঁচ। আজ খণ্ডিত ভারতের খণ্ডিত বাংলার, শুধু পশ্চিম বঙ্গেই মার্কসবাদী দলের সংখ্যা মোটে গোটা দশ বার, তাহারা আবার সকলেই খাঁটী। ব্যাকরণের উত্তম পুরুষ। তাহা হইলে যাইব কোথায়? কাহাকে গ্রহণ করিব? যাহাকেই খাঁটী মার্কসবাদী বলিয়া গ্রহণ করিব, সেই মুহূর্তেই অপর খাঁটী (!) মার্কসবাদী দলগুলি প্রতিক্রিয়াশীল, চক্রান্তকারী, জোতদারের দালাল বা বুর্জোয়াদের ভাড়াটে গুন্ডা প্রভৃতি তাহাদের স্বভাব সুলভ সুন্দর শব্দ প্রয়োগে আমাদের আপ্যায়িত করিতে থাকিবে। আর ইহাদের খাঁটী মেকীর যাচাই করিয়াই বা লাভ কি। যতক্ষণ ইহাদের

খাঁটী মেকীর যাচাই করিব, ততক্ষণে হয়ত আরও দুই চারিটা খাঁটী (!) মার্কসবাদী দল গজাইয়া উঠিবে। বিশেষভাবে নির্বাচন যখন আসন্ন, আর দল থাকিলেই যখন মন্ত্রিত্ব পাওয়া যায়। এখন উপায় কি-যাইব কোথায়?

১৬. মার্কস ও মার্কসবাদ লইয়া দেশের আবহাওয়াটি আজকাল খুবই উত্তপ্ত। অন্য একটি দৃষ্টিকোণ হইতে এই সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মার্কসবাদের মূল সূত্র বা কথাটি হইল-'গতিশীল বস্তু' ও 'দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব'। মার্কসের মতে যুগ যুগ ধরিয়া প্রকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যে পরিবর্তনগুলি ঘটিয়া আসিতেছে, মানুষ এতদিন তাহার প্রকৃত কারনটি ধরিতে না পারিয়া সব কিছুকেই ভগবানের খেয়াল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। মার্কস এই পরিবর্তনগুলিকে কোন কল্পিত শক্তির খেয়াল ভাবিয়া ছাড়িয়া না দিয়া ইহার কারণটি খুজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন। আবিস্কৃত হইল-'দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব'। যাত্রা যাহার শুরু হইয়াছে চিরন্তন এক অনাদি অতীতে এবং গতি যাহার সীমাহীন এক অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে। মার্কস মনে করেন, এই দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াই প্রকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সব রকমের সব পরিবর্তনগুলি ঘটাইয়া থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের ক্ষেত্রে, এই দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াটি প্রকাশ পায় শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে। তাহার মতে দ্বান্দ্বিক কারণে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়াই অতীতের শ্রেণী বিভক্ত দাস সমাজ ও সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা একে একে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সৃষ্টি হয় বর্তমানের এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। পরস্পর বিরোধী শ্রেণী বিভক্ত এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও একদিন ঐ একই দ্বান্দ্বিক কারণে শ্রেণী সংঘর্ষের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সৃষ্টি হইবে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর সমাজের যৌথ মালিকানা ভিত্তিক এক নূতন সমাজব্যবস্থা। মার্কসের মতে-এই পরিবর্তনগুলি মানুষের মন নিরপেক্ষ। ইতিহাসের অলঙ্ঘনীয় ধারা বাহিয়া মানব সমাজকে একদিন সেখানে পৌঁছাইতেই হইবে। মার্কসের জন্ম হইয়াছে ধনতন্ত্রের যুগে। তাঁহার জন্মের পূর্বেই দাস সমাজ ও সামন্তসমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়া বর্তমানের এই ধনতান্ত্রিক যুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মার্কসরে জন্মের পূর্বে যে সমাজ বিপ্লবগুলি ঘটিয়া গিয়াছে, মার্কস তাঁহার 'দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকেই' তাহারও মূল সূত্র বলিয়া মনে করেন। ভাবিকালের বিচারে সমাজ বিপ্লবের এই মার্কসীয় তত্ত্ব অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক কারনে শ্রেণী সংঘর্ষ, যদি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে এই সত্যও প্রমাণিত হইবে যে, মার্কসীয় তত্ত্বের এমন কি মার্কসের জন্ম না হইলেও ভবিষ্যৎ সমাজ বিপ্লবের কোনও ব্যাঘাত ঘটিত না এবং আগামী দিনের সমাজ বিপ্লবটি ঠিক তেমনিভাবেই সংঘটিত হইবে, ঠিক যেমনিভাবে মার্কস তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ যে সূত্রে মার্কস জন্ম নেওয়ার পূর্বেকার সমাজ বিপ্লবগুলি ঘটিয়া গিয়াছে, মার্কসীয় তত্ত্ব মতে সেই একই

বই বইয়ের ঠিকানা

প্রাক মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের পুরাতন সূত্র ধরিয়াই আগামী দিনের সমাজ বিপ্লবটিও সংঘটিত হইবে। তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে মার্কস বা মার্কসবাদের করণীয় কি আছে? মার্কসবাদকে অনেকে বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। কিন্তু মার্কসবাদ বিজ্ঞানের কোন নূতন সৃষ্টি নয়। মার্কস কোন নূতন পথেরও সন্ধান দেন নাই। তিনি অতীত ইতিহাসের গর্ভে লুক্কায়িত একটি অমূল্য সম্পদ-'একচিরন্তন সত্যকে' খুঁজিয়া আনিয়া মানুষের সামনে হাজির করিয়াছেন এবং আগামী দিনের সমাজ বিপ্লবীদের সেই চিরন্তন সত্যের আলোকে পথ দেখিয়া চলিতে আহ্বান জানাইয়াছেন মাত্র। মার্কসকে বলা যায় নূতন যুগের 'নূতন নিউটন'। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কারের পূর্বে গাছ হইতে ফল যেমন ভাবে মাটিতে পড়িত , আজও ঠিক তেমনি ভাবেই পড়িতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি ভাবেই পড়িবে। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কারে গাছ হইতে মাটিতে ফল পড়ার চারিত্রিক কোনও পরিবর্তন ঘটায় নাই। মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারে একটি নূতন সঞ্চয় হইয়াছে মাত্র। মার্কসের 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বের' আবিষ্কার যদি কালের বিচারে টিকিয়া থাকে সেটি হইবে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে আর একটি নূতন সঞ্চয়। তবে সঞ্চয়টির ফল হইবে সুদূরপ্রসারী। মার্কসের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের আবিষ্কারও সমাজ বিপ্লবের কোন চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটাইবে না। পূর্বেকার সমাজ বিপ্লবীরা ইতিহাসের অলঙ্ঘনীয় ধারা বহিয়া অচেতনভাবে সমাজরে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি ঘটাইয়াছিল, আজকের দিনের সমাজ বিপ্লবীরা আগামী দিনের সমাজ বিপ্লবের কাজটি সচেতনভাবেই করিতে পারিবে-মার্কসীয় তত্ত্বের ফলশ্রুতি এইটুকুই। আমাদের এই কথাটিও জানিয়া রাখা ভাল যে, মার্কসবাদ একটি সমন্বয়ের মতবাদ। মার্কসরে সময়ের এবং তাহার পূর্বেকার বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করিয়া তাহার সারবস্তু লইয়া তাহার সঙ্গে তাঁহার নিজস্ব মতামত যুক্ত করিয়াই মার্কস তাঁহার-'দ্বন্দ্বমূলক দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বকে দাঁড় করাইয়াছেন। মার্কসবাদ চির অপরিবর্তনীয় কোন অন্ধধর্মীয় অনুশাসন নয়। এই সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গলস বলেন-" আমাদের তত্ত্ব একটা অটল অনড় মন্ত্র নয়। ইহা হইল কর্মের পথ নির্দেশক" (মার্কসবাদ উৎস ও সারমর্ম, পৃ-৪৯)। লেনিন বলেন-"আমরা মনে করিনা যে মার্কসের চিন্তা স্বয়ং সম্পূর্ণ অথবা তাহার নড়,বড় হইতে পারে না" (আনন্দবাজার, ২১.৪.৭০)। মাওসেতুং বলেন-"মার্কসবাদ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই বিকাশ লাভ করবে, এটা অটল থাকতে পারে না। অপরিবর্তিত থাকলে এটা হয়ে পড়বে প্রাণহীন" (মাওসেতুংয়ের উদ্ধৃতি, পৃ-১৪,১৫)। সুভাষচন্দ্র বলেন-"আমরা যদি বিবর্তনবাদের শেষ সীমায় না এসে থাকি বা বিবর্তনবাদকেই যদি অস্বীকার না করি, তাহলে একথা বলা নির্বুদ্ধিতা হবে যে কোন একটা ব্যবস্থায় এসে মানব প্রগতি শেষ হয়ে যাবে। মানব

প্রগতি কোন দিন থামবে না। অতীতের অভিজ্ঞতাতেই আমাদের নূতন বিধান গড়ে তুলতে হবে। কেন না একটি মত বাথিওরী মানব জ্ঞানের শেষ কথা হতে পারে না" (নেতাজীর বাণী, পৃ-৭)।

বর্তমান আলোচনা হইতে এইটুকু বলা যায় যে, মার্কসবাদ-মার্কসবাদ করিয়া এতটা হৈচৈ করিবার মত কোন কারণ নেই। মার্কসবাদকে চির অপরিবর্তনীয় এক অভ্রান্ত সত্যরূপে ধরিয়া লইলেও দেশের বর্তমান পারিপার্শ্বিকতা বিচারে তাহাকে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। মার্কসবাদের শেষ লক্ষ্য 'শ্রেণী ও রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী সমাজ' গঠন ভবিষ্যতের ব্যাপার। তাহাকে সামনে রাখিয়া চলা যায়। কিন্তু তাহার প্রথম শর্ত বা মূল ভিত্তি- 'বস্তুবাদী তত্ত্ব' অর্থাৎ (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ) তাহাকে বাদ দিয়াতো কোন মার্কসবাদী অর্থাৎ কমিউনিষ্ট দল বা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে পারে না। মার্কস-লেনিনের ভাষায়-'ধর্ম হইল আফিম তুল্য, ধর্ম হইল মানুষের অন্ধত্ব'। কিন্তু বর্তমান আমাদের জাতীয় পরিবেশে চাই ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। আমরা ভারতীয়েরা কিছুটা ধর্মভীরু জাতি। প্রাক স্বাধীনতা যুগে ইংরেজ আমাদের ধর্মান্ধতার সুযোগ লইয়া কি ভয়াবহ খেলা খেলিয়াছে সে কথা আমরা সকলেই জানি এবং তাহার ফল আমরা আজও ভোগ করিতেছি। স্বাধীনোত্তর যুগেও মুসলিম ধর্মগুরুর তথাকথিত কিছু 'স্মারক চিহ্ন' খোয়া যাওয়ার নাম করিয়া বা এককানা 'গ্রন্থ সাহেব' অপবিত্র করণের খোয়ার তুলিয়া কি ধরনের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব হইতে পারে তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কাজেই আজকের দিনে আমাদের দেশে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে গেলে বা 'বস্তুবাদীতত্ত্ব' ভিত্তিক কোন দল গড়িতে গেলে এবং সেই নির্দেশ মতে চলিতে গেলে দেশ, সমাজ বিপ্লবের পথে যতটা আগাইয়া গিয়াছে ঠিক ততটাই পিছাইয়া যাইবে। অথচ মার্কসীয় তত্ত্বের মূল ভিত্তিকে বাদ দিয়া মার্কসবাদের স্বপ্ন বা প্রতিষ্টাও তো সফল হইতে পারে না। মার্কসবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করা হয়। কিন্তু বিশ্ব বিজ্ঞান কি আজও পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে মার্কসের 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বকে' বিশ্ব ও সমাজ বিকাশের একমাত্র নিয়ামক বলিয়া মানিয়া লইয়াছে?—না। বিজ্ঞানের বিচারে আজও এই তত্ত্ব প্রমাণ সাপেক্ষ। তাই আমাদের বক্তব্য ব্যক্তি জীবনে সে কেহই মার্কসবাদ, হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহারা লাভবানই হইবেন। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের তাহার সফল ও পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন প্রয়োগ বর্তমানেতো নয়ই, অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। মার্কসবাদ সম্বন্ধে আমরা আমাদের আলোচনাটি এইখানেই শেষ করলিাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ

তারাপ্রসাদ গুপ্ত

২৩.১.৭২.

বই বইয়ের ঠিকানা

পরিপ্রেক্ষিতঃ-

১. আমাদের পূর্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মার্কসবাদ বা গাধীবাদের বাস্তব বা সফল রূপায়ন বর্তমানেতো নয়ই, অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। এমন কি মার্কসবাদ বা গান্ধীবাদের পথে আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধানও সম্ভব নয়। এই সম্বন্ধে আমরা পরবর্তিকালে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

২. এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের বিচারে বসিতে হইবে এই ভাবনা লইয়া যে, বিভিন্ন অন্ধ ধর্মীয় ধ্বজাধারীদের মত, আমরাও কি আর এক ধরনের অন্ধত্ব লইয়া মার্কসবাদের বা গান্ধীবাদের প্রতিষ্ঠা, যাহা বর্তমানে অবাস্তব এবং ভবিষ্যতের চিন্তা তাহার প্রচারে মাতিয়া থাকিব, না আমাদের সমাজের বর্তমান পরিবেশ ও তাহার সমস্যাগুলি বুঝিয়া তাহার প্রতিকারে লাগিয়া যাইব? একজন সত্যিকার সমাজবিপ্লবীর বা একটি খাঁটি বিপ্লবী দলের কাজ কোনটি? বর্তমানকে অস্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন থাকা, না ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান সমস্যার সম্মুখীন হওয়া? আমরা মনে করি একটি খাঁটি বিপ্লবী দলের বা একজন সত্যিকার সমাজবিপ্লবীর একমাত্র কর্তব্য হইল, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমান সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং তাহার মোকাবিলা করা। এই লক্ষ্য সামনে রাখিয়া আজ আমাদের সমস্যাটি কি বুঝিতে হইবে এবং একটি বিকল্প সমাজ দর্শনের মধ্য দিয়া তাহার সমাধান কি ও পথ কোথায় খুজিয়া লইতে হইবে। এখন আমরা সেই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

আমাদের সমস্যা কি। সমাধান কি। পথ কোথায়।

৩. আমাদের সমস্যা আমাদের সমস্যা-গান্ধীবাদ নয়। আমাদের সমস্যা, মার্কসবাদ নয়। আমাদের সমস্যা-ক্ষুধা, বেকারী, দরিদ্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়। আমাদের সমস্যা-সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ভাষা, স্বতন্ত্রতা ও বিচ্ছিন্নতাকামী প্রভৃতি জাতীয়তা বিরোধী চিন্তা। আমাদের সম্যসা আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন শত্রুরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিনিয়ত আক্রমণ আশঙ্কা। আমাদের সম্যসা-বিগত প্রায় সারে সাতশত বছরে বিদেশী শাসন ও শোষনে পিষ্ট, অস্তিচর্মসার একটা অর্ধমৃত জাতির সর্বাঙ্গীন পুনরুজ্জীবন ঘটান। সর্ব্বোপরি আমাদের সমস্যা আদর্শ ও লক্ষ্যহীন, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী, মেরুদণ্ডহীন বন্ধ্যা ও দুর্বল এক রাজনৈতিক ও জাতীয় নেতৃত্ব।

৪. সমাধান কি? এবার আমরা আমাদের সমস্যাগুলির সমাধানটি কি, খুজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিব। গত প্রায় সারে সাতশত বছরই তো আমরা বাহির বিশ্ব হইতে ভাল-মন্দ অনেক মত ও পথের গোলামী শিখিয়াছি এবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব

স্বাধীন ভারত গঠনে, স্বদেশের মাটি থেকে কোন উপাদান আমরা সংগ্রহ করিতে পারি কিনা। আমরা একটা বিকল্প সমাজ দর্শনের মধ্য দিয়া আমাদের সমস্যাটি কি, সমাধান কি এবং পথ কোথায় এই তিনটি বিষয়ই জাতির সামনে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। সেই বিকল্প সমাধানটি হইল-'জাতীয়তাবাদ' ও সমাজবাদের সমন্বয়ে গড়া, সুভাষচন্দ্রের জীবন দর্শন-'জাতীয় সমাজবাদ' বা ভারতীয় সাম্যবাদ'।

৫. পথ কোথায়? বিপ্লব। বিপ্লব কি? পরিবর্তন। তবে যে কোন পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলা চলেনা। বিপ্লব হইল, প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা আমুল পরিবর্তন ঘটাইয়া, তাহাকে সামনের দিকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইতিহাস আমাদের উপহার দিয়াছে 'সুভাষচন্দ্রকে', - সুভাষচন্দ্র আমাদের উপহার দিয়াছেন, জাতিয়তা ও সমাজবাদের সমন্বয়ে গড়া তাঁহার জীবনদর্শন, 'জাতীয় সমাজবাদ' বা 'ভারতীয় সাম্যবাদ'কে। আমরা যদি সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন-'জাতীয়সমাজবাদ' অর্থাৎ 'ভারতীয় সাম্যবাদ', এই তত্ত্বের ভিত্তিতে, স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারি একমাত্র তবেই আমরা আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া স্বাধীন ভারতকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত ও অগ্রগামী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া আগাইয়া যাইতে পারি।

৬. এবার আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনের বিভিন্নদিক লইয়া আলোচনা করিব। এই আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে, আমরা সুস্পষ্ট ভাবে একথা বলিয়া লইতে চাই যে সুভাষচন্দ্রের জীবন দর্শন বলিতে আমরা তাঁহার রাজনৈতিক জীবনদর্শনের কথাই বুঝি। তাই আমরা আমাদের আলোচনাটি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিব এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়াই আমরা সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত মতে আমাদের সমস্যাগুলি কি, সমাধান কি এবং পথ কোথায় এই তিনটি বিষয়ই, পরিস্কার ভাবে জাতির সামনে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

৭. সুভাষচন্দ্রের জীবনে স্বপ্ন ছিল তিনটি। স্বাধীনতা, জাতীয়তা ও সমাজবাদ। তাঁহার স্বপ্ন ছিল প্রথমে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং পরে স্বাধীন ভারতকে জাতীয়তা ও সমাজবাদের আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা।

৮. স্বাধীনতা বলিতে সুভাষচন্দ্র কি বুঝিতেন? তাঁহার মতে, স্বাধীনতার প্রথম শর্ত হইল বিদেশী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বন্ধন পাশ থেকে জাতীয় মুক্তি অর্জন এবং দেশে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। সুভাষচন্দ্রের নিজ ভাষায় "আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা। আমাদের প্রথমে বৈদেশিক শাসন পাশ হতে মুক্ত হতে হবে" (বিপ্লব কি, সুভাষচন্দ্র পৃ-১১)। কিন্তু ইহাতেই সুভাষচন্দ্র সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বলেন "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ ধনীর মতো দরিদ্রের স্বাধীনতা।

বই বইয়ের ঠিকানা

পরিপ্রেক্ষিতঃ-

১. আমাদের পূর্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মার্কসবাদ বা গাধীবাদের বাস্তব বা সফল রূপায়ন বর্তমানেতো নয়ই, অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। এমন কি মার্কসবাদ বা গান্ধীবাদের পথে আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধানও সম্ভব নয়। এই সম্বন্ধে আমরা পরবর্তিকালে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

২. এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের বিচারে বসিতে হইবে এই ভাবনা লইয়া যে, বিভিন্ন অন্ধ ধর্মীয় ধ্বজাধারীদের মত, আমরাও কি আর এক ধরনের অন্ধত্ব লইয়া মার্কসবাদের বা গান্ধীবাদের প্রতিষ্ঠা, যাহা বর্তমানে অবাস্তব এবং ভবিষ্যতের চিন্তা তাহার প্রচারে মাতিয়া থাকিব, না আমাদের সমাজের বর্তমান পরিবেশ ও তাহার সমস্যাগুলি বুঝিয়া তাহার প্রতিকারে লাগিয়া যাইব? একজন সত্যিকার সমাজবিপ্লবীর বা একটি খাঁটি বিপ্লবী দলের কাজ কোনটি? বর্তমানকে অস্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন থাকা, না ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান সমস্যার সম্মুখীন হওয়া? আমরা মনে করি একটি খাঁটি বিপ্লবী দলের বা একজন সত্যিকার সমাজবিপ্লবীর একমাত্র কর্তব্য হইল, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমান সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং তাহার মোকাবিলা করা। এই লক্ষ্য সামনে রাখিয়া আজ আমাদের সমস্যাটি কি বুঝিতে হইবে এবং একটি বিকল্প সমাজ দর্শনের মধ্য দিয়া তাহার সমাধান কি ও পথ কোথায় খুজিয়া লইতে হইবে। এখন আমরা সেই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

আমাদের সমস্যা কি। সমাধান কি। পথ কোথায়।

৩. আমাদের সমস্যা আমাদের সমস্যা-গান্ধীবাদ নয়। আমাদের সমস্যা, মার্কসবাদ নয়। আমাদের সমস্যা-ক্ষুধা, বেকারী, দরিদ্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়। আমাদের সমস্যা-সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ভাষা, স্বতন্ত্রতা ও বিচ্ছিন্নতাকামী প্রভৃতি জাতীয়তা বিরোধী চিন্তা। আমাদের সম্যসা আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন শত্রুরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিনিয়ত আক্রমণ আশঙ্কা। আমাদের সম্যসা-বিগত প্রায় সারে সাতশত বছরে বিদেশী শাসন ও শোষনে পিষ্ট, অস্তিচর্মসার একটা অর্ধমৃত জাতির সর্বাঙ্গীন পুনরুজ্জীবন ঘটান। সর্ব্বোপরি আমাদের সমস্যা আদর্শ ও লক্ষ্যহীন, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী, মেরুদণ্ডহীন বন্ধ্যা ও দুর্বল এক রাজনৈতিক ও জাতীয় নেতৃত্ব।

৪. সমাধান কি? এবার আমরা আমাদের সমস্যাগুলির সমাধানটি কি, খুজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিব। গত প্রায় সারে সাতশত বছরই তো আমরা বাহির বিশ্ব হইতে ভাল-মন্দ অনেক মত ও পথের গোলামী শিখিয়াছি এবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব

স্বাধীন ভারত গঠনে, স্বদেশের মাটি থেকে কোন উপাদান আমরা সংগ্রহ করিতে পারি কিনা। আমরা একটা বিকল্প সমাজ দর্শনের মধ্য দিয়া আমাদের সমস্যাটি কি, সমাধান কি এবং পথ কোথায় এই তিনটি বিষয়ই জাতির সামনে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। সেই বিকল্প সমাধানটি হইল-'জাতীয়তাবাদ' ও সমাজবাদের সমন্বয়ে গড়া, সুভাষচন্দ্রের জীবন দর্শন-'জাতীয় সমাজবাদ' বা ভারতীয় সাম্যবাদ'।

৫. পথ কোথায়? বিপ্লব। বিপ্লব কি? পরিবর্তন। তবে যে কোন পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলা চলেনা। বিপ্লব হইল, প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা আমুল পরিবর্তন ঘটাইয়া, তাহাকে সামনের দিকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইতিহাস আমাদের উপহার দিয়াছে 'সুভাষচন্দ্রকে', - সুভাষচন্দ্র আমাদের উপহার দিয়াছেন, জাতিয়তা ও সমাজবাদের সমন্বয়ে গড়া তাঁহার জীবনদর্শন, 'জাতীয় সমাজবাদ' বা 'ভারতীয় সাম্যবাদ'কে। আমরা যদি সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন-'জাতীয়সমাজবাদ' অর্থাৎ 'ভারতীয় সাম্যবাদ', এই তত্ত্বের ভিত্তিতে, স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারি একমাত্র তবেই আমরা আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া স্বাধীন ভারতকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত ও অগ্রগামী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া আগাইয়া যাইতে পারি।

৬. এবার আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনের বিভিন্নদিক লইয়া আলোচনা করিব। এই আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে, আমরা সুস্পষ্ট ভাবে একথা বলিয়া লইতে চাই যে সুভাষচন্দ্রের জীবন দর্শন বলিতে আমরা তাঁহার রাজনৈতিক জীবনদর্শনের কথাই বুঝি। তাই আমরা আমাদের আলোচনাটি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিব এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়াই আমরা সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত মতে আমাদের সমস্যাগুলি কি, সমাধান কি এবং পথ কোথায় এই তিনটি বিষয়ই, পরিস্কার ভাবে জাতির সামনে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

৭. সুভাষচন্দ্রের জীবনে স্বপ্ন ছিল তিনটি। স্বাধীনতা, জাতীয়তা ও সমাজবাদ। তাঁহার স্বপ্ন ছিল প্রথমে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং পরে স্বাধীন ভারতকে জাতীয়তা ও সমাজবাদের আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা।

৮. স্বাধীনতা বলিতে সুভাষচন্দ্র কি বুঝিতেন? তাঁহার মতে, স্বাধীনতার প্রথম শর্ত হইল বিদেশী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বন্ধন পাশ থেকে জাতীয় মুক্তি অর্জন এবং দেশে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। সুভাষচন্দ্রের নিজ ভাষায় "আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা। আমাদের প্রথমে বৈদেশিক শাসন পাশ হতে মুক্ত হতে হবে" (বিপ্লব কি, সুভাষচন্দ্র পৃ-১১)। কিন্তু ইহাতেই সুভাষচন্দ্র সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বলেন "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ ধনীর মতো দরিদ্রের স্বাধীনতা।

বই বইয়ের ঠিকানা

ব্যক্তির মতো শ্রেণীর স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানে শুধু রাজনৈতিক বন্ধন মুক্তি নয়, সম্পদের সম বন্টন" (আনন্দবাজার ২৩.১.৬৪, পৃ-১০)। "আমরা চাই একটা নূতন সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, যে সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হবে না। যে সমাজে জাতি ভেদের অচলায়তন আর থাকবে না। যে সমাজে নারী মুক্ত হয়ে সমাজে এবং রাষ্ট্রে পুরুষের সাথে সমান অধিকার ভোগ করবে, যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকবে না। যে সমাজে শ্রমের ও কর্মের পূর্ণ মর্যাদা থাকবে এবং অলস ও নিষ্কর্মার কোনও স্থান থাকবে না। যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ পাবে। যে রাষ্ট্র বিজাতীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির হস্ত থেকে সর্ব বিষয়ে মুক্ত হবে। সর্বোপরি যে সমাজ ও রাষ্ট্র শুধু ভারতবাসীর অভাব মোচন করেই ক্ষান্ত হবে না, পরন্তু বিশ্ব মানবের নিকট আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র বলে প্রতিভাত হবে, আমি সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে থাকি' (বিপ্লব কি, পৃ-১৬, সুভাষচন্দ্র, নেতাজীর বাণী, পৃ-১০,১১)। ইহাই হইল সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ।

৯. সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের স্বাধীনতার প্রথম শর্ত সফল হইয়াছে। দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতার অন্যান্য শর্তগুলি অর্থাৎ যেখানে তিনি বলিতেছেন স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি 'ধনীর মতো দরিদ্রের স্বাধীনতা' এবং 'সম্পদের সম বন্টন' প্রভৃতি এই শর্তগুলি আজও পূর্ণ হয় নাই। এই শর্তগুলি পূর্ণ করিয়া ভারতের জাতীয় স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতায় পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয় ঘটাইয়া তাঁহার জীবন-দর্শন জাতীয় সমাজবাদী তত্ত্বকে দাঁড় করাইয়াছিলেন এবং চাহিয়াছিলেন, 'জাতীয় সমাজবাদের' আদর্শের ভিত্তিতে তিনি স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু এই কাজটি আজও পূর্ণ হয় নাই। সুভাষচন্দ্র আজ অনুপস্থিত। স্বাধীনোত্তর যুগের মানুষ আমরা, সুভাষচন্দ্রের জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব তাই স্বাভাবিক ভাবেই আজ আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

১০. জাতীয়-সমাজবাদ কি? জাতীয় সমাজবাদ হইল জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমাজবাদের একটা সমন্বয়। অর্থাৎ সমাজবাদের মূল শর্তগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিপূরক করিয়া, জাতীয়তার রসে সিঞ্চিত করিয়া, তাহার প্রতিষ্ঠা। ইহাই হইল জাতীয় সমাজবাদ। সুভাষচন্দ্রের নিজ ভাষায় "জাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সে ব্যবস্থা জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ আমরা ভারতে এমনই একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। অর্থাৎ সেটা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদেরই একটা সমন্বয় স্বরূপ" (দিনের বাণী)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহানায়ক

হিটলারের জার্মান নাৎসীদলের ঘোষিত আদর্শ ছিল 'জাতীয় সমাজবাদ' কাজেই স্বভাবতই আমাদের মনে একটা বিভ্রান্তি আসিতে পারে এই ভাবিয়া যে, সুভাষচন্দ্রও বুঝি হিটলারের জাতীয় সমাজবাদেরই উপাসক। এই সম্বন্ধে কাহারও ভুল বুঝিবার কোন অবকাশ না থাকে, তাই সুভাষচন্দ্র পরিস্কার ভাষায় বলেন, "জার্মানীর ন্যাশনাল সোস্যালিষ্টরা সেই সমন্বয় ঘটাতে পারেননি" (আনন্দবাজার ২৩.১.৬৩)। জার্মানীর "ন্যাশনাল সোস্যালিজম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিধানে এবং জনসাধারণের উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ভিত্তির উপরে যে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল ন্যাশনাল সোস্যালিজম তার আমূল সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়নি" (সুভাষবাদ ও মার্কসবাদ, পৃ-৩২)। সুভাষচন্দ্রের জাতীয় সমাজবাদের স্বপ্ন যে আমাদের মন গড়া কিছু উদ্ভট কল্পনা নয় এবং সুভাষচন্দ্রের জাতীয় সমাজবাদ আর নাৎসী জার্মানীর জাতীয় সমাজবাদ যে এক কথা নয়, সেটা সুভাষচন্দ্রের নিজি ভাষাতেই প্রমান পাওয়া গেল। এই সম্বন্ধে আমরা পরবর্তি কালে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

১১. জাতীয়বাদ কি? জাতীয়বাদ হইল, জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাসের ধারা, তাহার স্বার্থ, ভৌগোলিক পরিবেশ, ভাবাবেগ প্রভৃতি তাহার নিজস্ব বৈশিষ্টগুলি রক্ষা করা। অর্থাৎ জাতির যাহা কিছু সৎ, সুন্দর ও মহৎ তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বিশ্বের নবলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার হইতে তাহার সারবস্তু গ্রহণ করিয়া, জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট ও যুগোপযোগী করিয়া, তাহাকে মহৎ হইতে মহত্তরের পথে লইয়া যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা। ইহাই হইল সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য। সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ যে কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়, তাহা জাতীয়তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের নিজ উক্তিতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "যে জাতি প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে না চায়, সে জাতির বাঁচবার কোন প্রয়োজন নেই। কোন জাতি শুধু সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ পূরণের জন্য শ্রেষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। জাতি বড় হতে চাইবে বিশ্বমানবতাকে মহত্তর করবার জন্য, এই পৃথিবীকে সুন্দর ও কল্যাণময় বাসগৃহরূপে রূপান্তরের জন্য। ভারতের প্রথম উদ্দেশ্য প্রথমে নিজেকে রক্ষা করা এবং পরে বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সম্বৃদ্ধ করা" (নেতাজীর বাণী, পৃ-৫) (নূতনের সন্ধান, ৪র্থ সংস্করন, পৃ-৫৪, ৫৫ সুভাষচন্দ্র)।

১২. সমাজবাদ কি? সমাজবাদ বলিতে কি বুঝা যায়? সমাজবাদ বলিতে সমাজের একটা বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বুঝা যায়। সমাজবাদ, ধনবাদ, সামন্তবাদ প্রভৃতি হইল সমাজের এক একটি বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া গোটা সমাজটা দাঁড়াইয়া থাকে। আমরা বর্তমানে বাস করিতেছি ধনবাদী অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার অধীনে। সমাজবাদী অর্থনীতি হইল ধনবাদী অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী।

বই বইয়ের ঠিকানা

সমাজবাদী অর্থনীতির সঙ্গে ধনবাদী অর্থনীতির বিরোধ কোথায়-বৈষম্য কি জানিতে হইলে, প্রথমে আমাদের ধনবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্টগুলি জানিয়া লইলে, সমাজবাদী অর্থনীতির সঙ্গে তাহার বিরোধ কোথায় এবং বৈষম্য কি বুঝিতে সুবিধা হইবে। তাই আমরা প্রথমে ধনবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্টগুলি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করিয়া লইব। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে না। সংক্ষেপে ইহার মূল সূত্র দুইটি তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

১৩. ধনবাদ, ধনবাদী অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, ব্যবস্থায় কল-কারখানা খনি, বাগিচা, কৃষিক্ষেত্র, পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি পণ্য উৎপাদন, বন্টন ও সম্পদ আহরণের প্রায় সব রকমের সব উপায়গুলিই থাকে সাধারণত ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে ব্যক্তি মালিকানাধীনে। বাজার থাকে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ প্রতিযোগিতামূলক। উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে মুনাফা। ধনবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলি যেহেতু থাকে ব্যক্তিমালিকানাধীনে, উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে মুনাফা, বাজার থাকে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ প্রতিযোগিতামূলক, তাই ধনবাদী ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন হয় বাজারের চাহিদা বা সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নয়, উৎপাদন করা হয় অধিকতর মুনাফার আশায়-অপরিকল্পিতভাবে। ফলে বাজারের চাহিদার সঙ্গে যোগন বা সরবরাহের অনেক সময়েই সমতা থাকে না, আসে বাণিজ্যিক সঙ্কট। ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় সাধারণত দুই ভাবে এই সঙ্কট আসিয়া থাকে। কখন এই সঙ্কট আসে সামাজিক প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ার কারনে অর্থাৎ চাহিদার সঙ্গে যোগানের ঘাটতি হইতে। আবার কখন এই সঙ্কট আসে সমাজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উৎপাদনের কারণে অর্থাৎ চাহিদা হইতেও অধিক সরবরাহ হইতে। কখন হয়ত দেখা যাইবে যে বাজারে কোন একটি বিশেষপণ্যের যথেষ্ট চাহিদা আছে কিন্তু চাহিদা মত উৎপাদন ও সরবরাহ নেই। কারণ ঐ পণ্যে মুনাফা না থাকায় বা কম থাকায় বা অন্য যে কোন কারণেই হউক উৎপাদনকারী মালিক পক্ষ নূতন মূলধন নিয়োগে সেই পণ্যের অধিক উৎপাদনে কোন উৎসাহ বোধ করে না, বা সেই শিল্প হইতে মূলধন অধিকতর লাভজনক অন্যশিল্পে স্থানান্তরিত করে বা অধিকতর মূনাফা লুটিবার আশায় উৎপাদক মালিক শ্রেণী, বিশেষ বিশেষ সংস্থা ও তার নেতাদের সঙ্গে গোপন যোগসাজসে নানা কৌশলে উৎপাদন কমাইয়া দিয়া কৃত্রিম উপায়ে একটা ঘাটতি সৃষ্টি করে। এক কথায় সমাজের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনে ও সরবরাহে ঘাটতি থাকে। ফলে বাজারে চাহিদার সঙ্গে যোগানের কোন সমতা থাকে না। আসে সঙ্কট। এটা হইল পণ্যের অভাব জনিত সঙ্কট। সঙ্কট হইতে আসে দুর্নীতি। বাজারে চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের ঘাটতির সুযোগ লইয়া দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী মহল বাজারে যে মাল আসে তাহারও একটা অংশ লুকাইয়া ফেলে। সৃষ্টি হয় কালো বাজারের, এবং আবির্ভাব

ঘটে ভেজাল পণ্যের। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় মালের সন্ধানে হন্যে হইয়া ঘুরিয়া মরে। যদি বা প্রার্থিত মাল পাওয়া যায়, তাহা হইলে হয় তাহাকে অধিক মূল্যে সেই মাল ক্রয় করিতে হয়, অথবা তাহাকে ভেজাল মাল লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সমাজে দুর্নীতির স্রোত বহিতে থাকে। উন্নয়নশীল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ঘটনাগুলি হামেশাই ঘটিতে দেখা যায়। কারণ উন্নয়নশীল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, সাধারণত প্রায়শই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের নিম্নতম প্রয়োজনীয় চাহিদা মত পণ্য সরবরাহ করিতে সক্ষম হয় না। গত চব্বিশ বছর ধরিয়া স্বাধীন ভারতে ইহার যথেষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়াছি এবং পাইতেছি। আর একধরনের সঙ্কট আসে অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে। অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সুযোগ লইয়া মুনাফালোভী উৎপাদক মালিক শ্রেণী, অধিক মুনাফার আশায় সমাজের অর্থাৎ বাজারের চাহিদা হইতেও অধিক পণ্য উৎপাদন করিয়া ফেলে। এক্ষেত্রেও চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের কোন সমতা থাকে না। আসে সঙ্কট, অধিক উৎপাদন জনিত সঙ্কট। এই সঙ্কট হইতে পরিত্রানের উদ্দেশ্যে উৎপাদক সংস্থাগুলি অর্থাৎ মালিক শ্রেণী নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। কখনওবা তাহারা নিজেরাই কলকারখানা বন্ধ করিয়া দিয়া উৎপাদন কমাইয়া ফেলে। কখন বা বিশেষ বিশে, সংস্থা ও তাহার কর্ম-কর্তাদের সঙ্গে গোপন বন্দোবস্ত করিয়া কলকারখানায় ধর্মঘট বাধাইয়া দিয়া উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয় এবং এই সুযোগে বাজারে একটা কৃত্তিম চাহিদার সৃষ্টি করিয়া, পূর্বের উদ্বৃত্ত মজুদ পণ্য বাজারে ছাড়িয়া দিয়া, অধিক উৎপাদন জনিত সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে। ফল একই। কল-কারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়, সাধারন মানুষ নানা অসুবিধায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। গোটা দেশ একটা সার্বিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ধনবাদের মুনাফা ভিত্তিক অপরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থার ইহাই হইল স্বাভাবিক পরিণতি। প্রতিটি উন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রে এক একটি বিশেষ সময়ের ব্যবধানে, অধিক উৎপাদন জনিত এই সঙ্কট আসিয়া থাকে। ধনবাদী অর্থনীতির আর একটি ক্রটী হইল, এই ব্যবস্থায় পণ্য মূল্য নির্ধারিত হয়, পণ্যের উৎপাদন খরচ বা সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নয় পণ্যের মূল্য নির্ধারত হয় পণ্য উৎপাদনকারী কলকারখানার মালিক, ধমিক শ্রেণীর অধিকতর মুনাফার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। ফলে পণ্য মূল্য অনেক সময়ে সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়। সাধারন মানুষ নানাবিধ দুঃখকষ্টে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়। ধনবাদের ক্ষুধা সীমাহীন-চির অতৃপ্ত। প্রতিটি ধনবাদীই (ধনিক) চাহেন পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদের তিনিই হইবেন একচ্ছত্র অধীপতি। এই কামনা হইতে আসে, অধিক মুনাফালাভের আশায় অধিক উৎপাদন স্পৃহা। প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থাৎ চাহিদা হইতেও অধিক উৎপাদন হইতে আসে মন্দা অর্থাৎ বাণিজ্যিক সঙ্কট। অধিক

বই বইয়ের ঠিকানা

উৎপাদনজনিত সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় ধনবাদ কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার কিছু পরিচয় আমরা পূর্বে পাইয়াছি, এখানে আরও কিছু তথ্য রাখিতেছি। অধিক উৎপাদনজনিত এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে যাইয়া, ধনবাদ অন্তর্দ্বন্দে জড়াইয়া পরে। অন্তর্দ্বন্দ্ব মানে ধনিক শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে বিরোধ। জাতীয় ক্ষেত্রে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়, প্রতিযোগীতার ভিতর দিয়া নিজ দেশের ধনিক শ্রেণীর অপরাপর অংশগুলিকে হটাইয়া দিয়া, স্বদেশের বাজারটি একচেটিয়াভাবে নিজ দখলে বা কর্তৃত্বে আনিবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অন্তর্দ্বন্দ্বটি প্রকাশ পায়, বিশ্ববাজার দখলের লড়াইয়ে। বিশ্ববাজার দখলের লড়াই মানে উন্নত শক্তিধর ধনবাদী রাষ্ট্রগুলি, সশস্ত্র অভিযান চালাইয়া, গায়ের জোরে দুর্বল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে দখল করিয়া লয়। যেমন ১৯৩৬ সনে, ইটালী কর্তৃক 'আবিসিনিয়া' দখল, ইহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বা অপর উন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক পূর্বের দখলীকৃত রাষ্ট্র অর্থাৎ উপনিবেশগুলিকে তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিজ দখলে আনে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর হাত হইতে তাহার উপনিবেশগুলি ছিনাইয়া আনিয়া ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লয়। তারপর দখলদার রাষ্ট্রগুলি নানা কৌশলে, দখলীকৃত ঐ রাষ্ট্রগুলির শিল্পসমূহকে ধ্বংশ করিয়া দিয়া ঐ দেশগুলিকে, একাধারে নিজ দেশের কলকারখানায় স্বল্প মূল্যে কাচামাল সরবরাহের ঘাটি করিয়া রাখে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ দেশের কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ঐসব দখলীকৃত রাষ্ট্রগুলিতে রপ্তানি করিয়া অর্থাৎ বিক্রয় করিয়া মুনাফা লোটে। ইহাই হইল বাজার দখলের লড়াই এবং তাহার উদ্দেশ্যে এইভাবে উন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজ দেশের অধিক উৎপাদনজনিত সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে। ইহার বহু পরিচয় আমরা ভারত সহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিদেশ পদানত রাষ্ট্রগুলিতে দেখিয়াছি। যাক্! বিশ্ব বাজার দখলের এই লড়াই কখন কখন ধনবাদী রাষ্ট্রগুলিকে পরস্পরের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। এই সশস্ত্র সংঘর্ষ কখন বা সীমাবদ্ধ থাকে দুই একটি রাষ্ট্রের নিজেদের মধ্যে, কখন বা এই সংঘর্ষ পরিণত হয় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে। ধনবাদী রাষ্ট্রগুলির বাজার দখলের এই বিশ্বব্যাপি মহাযুদ্ধকে এক কথায় বলা যায় বিশ্ব ধনবাদের আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধ। এই পটপ্রেক্ষিতে; ১৯১৪-১৮ সনের প্রথম মহাযুদ্ধ ও ১৯৩১-৪৫ সনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ক্ষেত্র বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম থাকিলেও এক কথায় বলা চলে, বিশ্ব ধনবাদের আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধ। ধনবাদ বর্তমানে একচেটিয়া বাণিজ্য ও লগ্নি প্রথা প্রবর্তন করিয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনজনিত বিভিন্ন সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে। একচেটিয়া বাণিজ্য মানে মূলত একই ধরনের কতগুলি পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও বন্টন প্রভৃতি ব্যবস্থার সবরকম সব

উপায়গুলি একই ধনিক গোষ্ঠির হাতে ন্যস্ত রাখিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন প্রবনতা কমাইয়া আনিয়া ধনিক শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ গোষ্ঠি স্বার্থে পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রন করা। ধনবাদের লোভ অপরিসীম, সঙ্কটও তাহার নানাবিধ। ধনবাদের আর একটি সঙ্কট হইল উদ্বৃত্ত অর্থ লইয়া। ধনবাদী কৌশলে, ধীরে ধীরে সমাজের অধিকাংশ ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় হইতে মুষ্টিমেয়োর হাতে আসিয়া কেন্দীভুত হইতে থাকে। ব্যক্তি বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত এই বিপুল অর্থের একটা বিরাট অংশ উদ্বৃত্ত হইয়া অব্যবহৃত অবস্থায় অলস হইয়া পড়িয়া থাকে। উন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রগুলির নূতন সম্যসা কি ভাবে এই বিপুল উদ্বৃত্ত অলস অর্থকে সচল করা যায়। উন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রগুলি এই বিপুল উদ্বৃত্ত অলস অর্থ যতটা সম্ভব নিজ স্বার্থ ও সুবিধামত চুক্তি শর্তে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমূহে কলকারখানা করিয়া বা বিভিন্ন উন্নয়ের কাজে সুদে লগ্নী করিয়া একাধারে এইসব রাষ্ট্রকে পূজী লগ্নীর বেড়াজালে বাঁধিয়া ফেলিয়া, নিজ তারে রাখিতে চেষ্টা করে, অপর দিকে পূঁজির সুদে পুঁজি বৃদ্ধির একটি নূতন পথ সৃষ্টি করিয়া অলস পূজিকে সচল করিয়া লয়। ধনবাদ চিরসঙ্কট জর্জরিত। তাই এই পথেও তাহার সমাধান আসে না। আসে নূতন সঙ্কট। এই সঙ্কট আসে উন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগেতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারনে। প্রতিটি উন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর উন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উদ্দেশ্য কোন ধনবাদী রাষ্ট্র কত অধিক সংখ্যক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে নিজ আওতায় আতি পারে, অর্থাৎ নিজ পঁজি লগ্নির একচেটিয়া বাজার করিয়া রাখিতে পারে। প্রতিযোগিতার নূতন ক্ষেত্রে আসে আর একটি নূতন সঙ্কট। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উঠতি ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে পূজী লগ্নিকারী দেশের ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হইয়া যায়। ঘনাইয়া আসে দিকে দিকে সশস্ত্র সংঘর্ষের কাল মেঘ। ধনবাদ নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরপুর। ধনবাদী অর্থনীতি সমাজের এক চিরন্তন সঙ্কট। এই সঙ্কট হইতে ধনবাদ কখন মুক্ত হইতে পারে না। ধনবাদী ব্যবস্থাপনার জন্মগত ত্রুটি হইল, এই ব্যবস্থায় যাহারা উৎপাদন করে তাহারা ফলের অধিকারী হয় না, আর যাহার ফল ভোগ করে তাহারা উৎপাদন করে না। ধনবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় যৌথ উদ্যোগে সামাজিক ভাবে, কিন্তু ভোগ হয় ব্যক্তি স্বার্থে। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার অর্থাৎ ভোগের এই অসম ব্যবস্থাপনার জন্য ধনবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রে বিরোধ ও সঙ্কট লাগিয়াই থাকে। ধনবাদী অর্থনীতির এই সব ত্রুটি ও চিরন্তন সঙ্কট হইতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার বিকল্প ব্যবস্থা হইল-সমাজবাদ অর্থাৎ সমাজবাদী অর্থনীতি।

১৪. সমাজবাদ। সমাজবাদী অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কল কারখানা, খনি, বাগিচা, কৃষিক্ষেত্র, পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি পণ্য উৎপাদন, বন্টন ও সম্পদ আহরণের

বই বইয়ের ঠিকানা

সব রকমের উপায়গুলিই থাকে সমাজের যৌথ সম্পত্তিরূপে সামাজিক মালিকানাধীনে, রাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণে। বাজার থাকে প্রতিযোগিতাহীন ও নিয়ন্ত্রিত এবং উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে সামাজিক প্রয়োজন। সমাজবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বন্টনের উপায়গুলি এবং বাজার যেহেতু থাকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে এবং উৎপাদন হয় মুনাফার লোভে নয়, সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পিতভাবে, তাই সমাজবাদী রাষ্ট্রে চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সব সময়ে সাধারনতই বা স্বভাবতই একটা সমতা থাকে, কোন সঙ্কট আসে না। সমাজবাদী রাষ্ট্রকে অধিক উৎপাদনজনিত সঙ্কট হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য যেমন স্বদেশের বাজারে প্রতিযোগিতার কোন প্রয়োজন করে না, বাজারের সন্ধানে পৃথিবীময় জুড়িয়া মরিতে বা বাজার দখলের লড়াইয়ে নামিতে হয় না, তেমনি ঘাটতির কারনে তাহার বেকার ও ক্ষুধার্ত মানুষের দলকে চাকুরি ও খাদ্যের সন্ধানে ঘুড়িয়া মরিতেও হয় না। কারণ সমাজবাদী রাষ্ট্রে উৎপাদন ও বন্টনের লক্ষ্য থাকে সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের নিম্নতম প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুযোগ প্রভৃতি হেতু বা অজন্মার কারণে বা পরিকল্পনার কোন ত্রুটির জন্য যদি বা কখন কোন সঙ্কট আসেও তবে সেটা হয়, খুবই ক্ষণস্থায়ী। কারণ সমাজবাদী রাষ্ট্রে সমাজের সমস্ত ধনসম্পদ এবং উৎপাদন ও বন্টনের সব রকমের সবউপায়গুলি রাষ্ট্রের হাতে থাকায় সমাজবাদী রাষ্ট্র অতি দ্রুত গতিতে অল্পকালের মধ্যেই এই সঙ্কট হইতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে মুক্ত করিতে পারে। সমাজবাদী রাষ্ট্রে উৎপাদনও যেমন হয় সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তেমনি পণ্য মূল্যও নির্ধারিত হয় সমাজের অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সঙ্গে সমতা রাখিয়া। সমাজবাদী রাষ্ট্রে কখন খেয়াল খুশী মত পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করা হয় না, তাই সমাজবাদী রাষ্ট্রে মানুষকে স্বভাবতই পণ্য মূল্য বৃদ্ধি জনিত কোন সঙ্কটে ভুগিতে হয় না।

সমাজবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট হইল এখানে উৎপাদনও যেমন হয় সমাজের যৌথ উদ্যোগে সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার ভোগের ব্যবস্থাও থাকে তেমনি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের নিম্নতম প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। সমাজবাদী রাষ্ট্র বা সমাজের লক্ষ্য হইল সম্পদ ও দারিদ্রের সমবন্টন। সচ্ছলতার দিনে সকলে যেমন সমভাবে তাহার ফল ভোগ করিবে। অভাব অনটন আসিলেও তেমনি সমভাবেই তাহাকে ভাগ করিয়া লইবে। ইহাই হইল একটি আদর্শ সমাজবাদী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। ধনবাদ হইল সামাজিক অন্যায় ও অবিচার-সমাজবাদ হইল সামাজিক ন্যায় বিচার।

১৫. ধনবাদী ও সমাজবাদী উভয় ব্যবস্থাতেই উৎপাদন হয় একই সামাজিক পদ্ধতিতে-কিন্তু উৎপাদন সম্পর্ক হয় পৃথক পৃথক। ধনবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বন্টনের সব রকমের সব উপায়গুলি থাকে ব্যক্তি মালিকানাধীনে সমাজবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন ও

বন্টনের সবরকমের সব উপায়গুলি থাকে গোটা সমাজের যৌথ সম্পত্তিরূপে সামাজিক মালিকানাধীনে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে। ধনবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যক্তি মানুষের কোন দায়িত্ব গ্রহন করে না, সমাজবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করে এবং সেটা তার নৈতিক কর্তব্য বলিয়া মনে করে। ধনবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় মুনাফার লোভে - আর সমাজবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় সমাজের প্রয়োজনে। ধনবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থ হইতে উৎপাদনের খরচ খরচা বাদ দিয়া একটা অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত অর্থ উৎপাদক সংস্থার মালিক শ্রেণীর হাতে আসে। এই উদ্বৃত্ত অর্থই লভ্যাংশ বা মুনাফা নামে পরিচিত। উদ্বৃত্ত অর্থের অধিকারী মালিক শ্রেণী, এই অর্থ খরচ করে তাহার ব্যক্তি স্বার্থে ভোগ ও লালসায় অথবা জমা হয় তাহার ব্যক্তিগত আমানতী তহবিলে। উদ্বৃত্ত অর্থে গড়া আমানতী তহবিলের অপর নাম পূঁজি। পূঁজির অধিকারী মালিক শ্রেণী পূঁজিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করিয়া পূঁজিহীন সাধারন মানুষের শ্রমশক্তিকে কিনিয়া লইয়া সেই শ্রমশক্তিকে বিভিন্ন উৎপাদনের কাজে ব্যবহাক করিয়া পূর্ববর্ণিত উপায়ে পূঁজি বৃদ্ধি করিয়া চলে। এইভাবে ধীরে ধীরে সমাজের অধিকাংশ ধনসম্পদ ব্যক্তিবিশেষের হাতে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। ব্যক্তি বিশেষের হাতে বিপুল ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সমাজে নানা ধরনের দুর্নীতির সৃষ্টি হয় এবং সাধারন মানুষ নানা দুঃখ কষ্টে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়। কোন উন্নয়নশীল ধনবাদী রাষ্ট্রে কোন ক্ষমতাসীন দল বা রাষ্ট্রনায়ক যদি শুভ বুদ্ধি বলে সমাজের অর্থাৎ সাধারন মানুষের কল্যানের জন্য কোন বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহন করিতে যায়, তবে সেই পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিবার পথে প্রথম বাধা আসে অর্থের দিক হইতে। অনেক সময়েই রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার পরিকল্পনার কাজে প্রয়োজনীয় অর্থসরবরাহ করিতে পারে না। কাজেই পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে তাহাকে নূতন নোট ছাপাইয়া বা নূতন কর বসাইয়া জনসাধারণকে আরও অসুবিধায় ফেলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। অপরিকল্পিতভাবে অধিক নোট ছাপাইতে গেলে মুদ্রা স্ফীতি ঘটে, অর্থাৎ টাকার মূল্য কমিয়া যায়, পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পায়, সাধারন মানুষ নূতন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।

১৬. সমাজবাদ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়ত করেন নাই। কিন্তু স্বাধীন ভারতকে যে সমাজবাদের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে একথা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বহু যায়গায় বহুবার বলিয়াছেন। সমাজবাদের মূল শর্তগুলি জানা না থাকিলে সমাজবাদী অর্থনীতির ভিত্তিতে কি ভবে দেশের পুনর্গঠনের কাজটি সফল করিয়া তুলিতে হইবে, সেই ধারণাটি পরিস্কার হইতে পারে না, তাই আমরা আমাদের আলোচনার মাধ্যমে সমাজবাদের মূল তত্ত্বটি অর্থাৎ তাহার শর্তগুলি তুলিয়া ধরিতে

বই বইয়ের ঠিকানা

চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের সমাজবাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সমাজবাদী চিন্তার যে কোন বিরোধ নেই একথা সুভাষচন্দ্রের নিজ ভাষাতেই প্রকাশ পায়। সুভাষচন্দ্র বলেন, "দরিদ্র ব্যাধি দূর করা তথা বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা করা একমাত্র সমাজবাদী উপায়েই সম্ভব। আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনায় দারিদ্র ও বেকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব যদি আমরা বেসরকারী ব্যক্তির উদ্যমের উপর ছেড়ে দেই, তাহলে কয়েক শতাব্দীতেও এ সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতের জনগণ সমাজবীদ ব্যবস্থা চায়। বেসরকারী ব্যক্তির হাতে আর্থিক উন্নয়নের উদ্যম ছেড়ে দেওয়া হবে না" (নেতাজীর বাণী, পৃ-৮)। সুভাষচন্দ্রে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা পরে আরও তথা পরিবেশন করিব।

১৭. জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লইয়া কিছুটা আলোচনা করা গেল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার একটা সমন্বয় ঘটাইয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার জীবন-দর্শন 'জাতীয় সমাজবাদী তত্ত্বকে' দাঁড় কারইয়াছিলেন এবং এই জাতীয় সমাজবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আমরা মনে করি, এই একটি মাত্র পথেই নানা সমস্যাভারে জর্জরিত ভারত, তাহার বর্তমান সঙ্কটগুলি কাটাইয়া উঠিতে পারে। তরুণ ভারতকে আজ আগাইয়া আসিয়া তাহার কর্তব্য স্থির করিতে ও পথ বাছিয়া লইতে হইবে।

১৮. সুভাষচন্দ্রে স্বপ্ন-'স্বাধীনতা, জাতীয়তা ও সমাজবাদ', এই তিনটি বিষয় লইয়াই আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহার নিজ বক্তব্যের উদ্ধৃতির সাহায্যেই আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবার আমরা সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে যে সব কথা প্রচলিত আছে, সেই সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করিব। এই আলোচনার মধ্য দিয়া আমরা স্বাধীন ভারত গঠনে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনার একটি স্বচ্ছ রূপও তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে রাজনৈতিক মহলের বিভিন্ন মতামতের উত্তর।

১৯. সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে মোটামুটি ভাবে তিনটি কথা প্রচলিত আছে। ১। সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী, ২। সুভাষচন্দ্র গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী, ৩। সুভাষচন্দ্র ছিলের একজন জাতীয়তাবাদী, স্বাধীন ভারত গঠনে তাঁহার কোন পরিকল্পনা ছিল না এবং সমাজবাদ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বক্তব্য নেই। এই মন্তব্যগুলির জবাব আমরা সুভাষচন্দ্রের নিজ বক্তব্যের উদ্ধৃতির মাধ্যমেই দিতে চেষ্টা করিব।

২০। (১) সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী? এটা আমরা সকলেই জানি যে মার্কসীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হইল 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'। বস্তুবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী না হইলে কেহ মার্কসবাদী হইতে পারে না। মার্কসীয় তত্ত্ব মতে বিশ্ব জগতের মূল কথা হইল 'গতিশীল বস্তু, তাহার আভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া ও বিকাশ'। সুভাষচন্দ্র বলেন, "জগতের মূলশক্তি আদ্যাশক্তি। তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর" (যুগবাণী, ৭.৩.৭০, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ-৫৫) (তরুনের স্বপ্ন, ৭ম সংস্করন, পৃ-১৩৬)। "দুর্গা, কালি প্রভৃতি মূর্তিশক্তির রূপ বিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে মানুষ শক্তি লাভ করিতে পারে"। (তরুনের স্বপ্ন পৃ-৫৩)। "ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পন করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন তিনি ধন্য। তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার মানবজীবন সফল"। (দিনের বাণী, যুগসঙ্ঘ-২৪.৮.৭২)। সুভাষচন্দ্র যে আবাল্য ভগবৎ বিশ্বাসী ছিলেন, সুভাষজীবন সম্বন্ধে যাঁহারা সামান্যতম খোজখবর রাখেন, তাঁহারাই একথা জানেন। যৌবনের প্রারম্ভে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে তিনি একবার গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, একথাও সকলের জানা আছে। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে, সুভাষচন্দ্র দক্ষিনেশ্বরের মন্দিরে পূজা দেওয়াইয়াছিলেন, ইহাও অনেকেই শুনিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র দক্ষিনপূর্ব এশিয়ায় আসিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহন করিতে যাইয়া, তাঁহার শপথ বাক্যে বলেন, "আমি সুভাষচন্দ্র, ভগবানের নামে এই পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহন করিতেছি যে, শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি স্বাধীনতার এই পবিত্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইব" (আনন্দবাজার, ১.৫.৫৬)। সম্প্রতি যুগবাণী ও যুগান্তর পত্রিকার একটি সংবাদে দেখিতেছি যে একটি বিদেশী সংবাদপত্রে নাকি কম্বোডিয়ায় যুদ্ধরত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক শক্তিধর মহাপুরুষের কথা উল্লেখ করিয়াছে, যাঁহাকে অনেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলিয়া মনে করেন। অলৌকিক, শক্তিধর, মহাপুরুষ প্রভৃতি শব্দগুলি সাধারণত ভগবৎ বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আবাল্য সুভাষচন্দ্র যতদিন ভারতে ছিলেন, যখন ভারত ত্যাগ করেন, যখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধীনায়করূপে শপথ গ্রহন করেন এবং আজ ১৯৭০ সন পর্যন্ত (যুগান্তরও যুগবাণীর সংবাদ যদি সত্য হইয়া থাকে) তিনি কখন তাঁহার ভগবৎ বিশ্বাস হারান নাই। তাহা হইলে, কেমন করিয়া সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী হইলেন এবং কখন হইলেন?

যাহাই হউক, সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তাঁহার নামে প্রচারিত কোন উক্তি বা বক্তব্য লইয়া আরও আলোচনায় যাওয়া শোভন বা উচিত হইবে না। সৈনিক জীবনে একটা কথা আছে, সেনাপতির 'শেষ আদেশই চূড়ান্ত আদেশ'। সৈনিক ও সেনাদলকে সৈন্যাধক্ষের শেষ, আদেশকেই 'চূড়ান্ত আদেশ' বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। রাজনৈতিক

বই বইয়ের ঠিকানা

দল ও তাহার কর্মীদের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য। কারন রাজনৈতিক দল ও তাহার কর্মীরাও সৈনিক বিশেষ। নেতার শেষ আদেশকেই চূড়ান্ত আদেশ বলিয়া তাহাদেরও মানিয়া লওয়া উচিত। সুভাষচন্দ্র জাতির উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে তাঁহার শেষ বক্তব্য রাখিয়াছেন, তাঁহার টোকিও ভাষণে-১৯৪৪ সনের নভেম্বর মাসে। আমরা সুভাষচন্দ্রের টোকিও বক্তৃতা ও অন্যান্য লেখা হইতে তাঁহার নিজস্ব বক্তব্যগুলি তুলিয়া ধরিতেছি। সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্যগুলির মধ্য দিয়াই সুভাষচন্দ্র যে মার্কসবাদী নন ইহা প্রতিপন্ন হইবে, মার্কসবাদ সম্বন্ধে তাঁহার মতামতটি জানা যাইবে। এবং মার্কসবাদী দলগঠন সম্পর্কে তাঁহার পূর্বোল্লিখিত উক্তিটির অসারত্ব প্রমাণিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন উক্তির উদ্বতির মাধ্যমে তাঁহার নিজস্ব মতবাদটিও তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। সুভাষচন্দ্র বলেন — "আমাদের জাতীয় আন্দোলন জনসাধারণের অর্থাৎ শ্রমিক ও কিষাণদের স্বার্থের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী ভাবে নিজেকে জড়িত করেছে। এ কারণে ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট (মার্কসীষ্ট) পার্টির মত আলাদা একটি দল থাকাবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই" (দিনের বাণী)। ("মার্কস-ইজমের তরঙ্গ এদেশে এসে পৌঁছেছে। এই তরঙ্গের আঘাতে কেউ কেউ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কার্ল মার্কসের মতবাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করলে, আমাদের দেশ সুখ ও সম্বৃদ্ধিতে ভরে উঠবে একথা অনেকে বিশ্বাস করেন। .....আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি অন্যদেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুসরণ করার বিরোধী। .....কমিউনিজমের অর্থনৈতিক দিক ভারতের মন আকর্ষণ করবে, কিন্তু অন্যদিকে কমিউনিজম দুর্বল।.....ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা যা কমিউনিজমের (মার্কসবাদের) মূল ভিত্তি তা ভারতে গৃহীত হবে না। ...মার্কসবাদে মানবজীবনের অর্থনৈতিক দিকটির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ....অর্থনৈতিক দিকটির গুরুত্ব আমরা বুঝি, কিন্তু তাই বলে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করারও কোন প্রয়োজন নেই। ...ভারত প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ। শ্রমিকের চেয়ে কৃষকশ্রেণীর সমস্যার উপরে তাই আমাদের অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ....এক শতাব্দীর পুরানো কমিউনিজম আজকের জ্ঞান বিজ্ঞানের ধোপে টিকছে না। ফ্যাসিবাদ প্রত্যাখ্যাত। প্রাচীনপন্থী গান্ধীবাদও সচল নয়। মানব সভ্যতার জীবনদর্শন এগিয়ে চলেছে ফরাসী বিপ্লব থেকে চীন বিপ্লবে। নূতন সভ্যতার মর্মবাণী নিয়ে। এ যুগের শেষ গণবিপ্লব হবে ভারতে। সমন্বয়ের আদর্শ হবে এই গণবিপ্লবের দিগদর্শন। এই সমন্বয়বাদ কি। সুভাষচন্দ্র বলেন, "আমার মত হলো পৃথিবীর বিভিন্ন মতবাদের প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর দিকগুলির সমন্বয় সাধন। .....ভারতের কাজ হলো-এমন একটি সমাজব্যবস্থার উদ্ভাবন করা যা হবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচলিত ব্যবস্থার সমন্বয়"। স্বাধীন ভারতের দৃষ্টি হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কল্যাণকর দিকগুলির পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন"

(টোকিও বক্তৃতা, নেতাজীর বাণী, পৃ-৬,৭,১০)। সুভাষচন্দ্র বলেন, "জাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে ব্যবস্থা জনসাধারণের সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ, ভারতবর্ষে আমরা এমনই একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই অর্থাৎ সেটা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের একটা সমন্বয় স্বরূপ" (ফরোয়ার্ড ব্লকে সুভাষবাদ ও মার্কসবাদ, পৃ-৩৩)। "ভারতকে তার নিজস্ব সমাজবাদ ও কর্মপরিকল্পনা গড়ে নিতে হবে। আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে ভারত তথা পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের ওপর। ভারত যে সমাজবাদ গড়ে তুলবে তার সঙ্গে নতুনত্ব ও নিজ বৈশিষ্ট থাকবে—সমগ্র পৃথিবীও এই সমাজবাদদ্বারা উপকৃত হবে" (টোকিও বক্তৃতা নেতাজীর বাণী, পৃ-৮)। "এই সমাজবাদ কার্লমার্কসের পুঁথিতে জন্ম নেয়নি, এর উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষেরই চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মধ্য হতে" (দিনের বাণী, ২৫.৩.৬৩)। "আজকাল সমাজতন্ত্রের নূতন চিন্তাধারা পশ্চিম হতে ভারতে আসছে এবং বহুলোকের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারা আমাদের দেশে নূতন কিছু নয়। আমরা সমাজতন্ত্রকে নূতন মতবাদ বলে মনে করে থাকি কারণ আমরা আমাদের নিজেদের ইতিহাসের সূত্রকে হারিয়ে ফেলেছি" (দিনের বাণী, ২১.৩.৬৩)। "কমিউনিজম মূল ত্রুটী হইল এই যে জাতীয় মনোভাবের মূল্য সে বুঝে না" (দিনের বাণী)। ইহার পরেও কি সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে? আমরা মার্কসবাদের কোন বিরুদ্ধ সমালোচনায় নামি নাই। মার্কসবাদ ভাল কি মন্দ বিচারেও আমরা বসি নাই। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী কিনা। সুভাষচন্দ্র তাঁহার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় হয়ত মার্কসীয় তত্ত্ব হইতে অনেক কিছু গ্রহন করিতে পারেন। কিন্তু কোন একটা মতবাদ হইতে তাহার কিছু অংশ গ্রহন করিলেই যদি সেই সেই মতবাদকে গ্রহন করা হয়, তাহা হইলে মার্কসবাদ বলিতে তো বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কারন মার্কস তাহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া তাঁহার পূর্বেকার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট হইতে বহু তথ্যই গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কস একথা নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রকে আমরা যতটুকু জানি, তাঁহার বিভিন্ন লেখা প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাঁহার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে 'সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী নন'। সুভাষচন্দ্র তাঁহার ব্যক্তিজীবনের বিশ্বাসকে কখন রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলেন নাই। আজ যাঁহারা সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে, তাঁহার ব্যক্তিজীবনের বিশ্বাসকে রাজনীতির সঙ্গে জড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের নিজেদের মতামতকেই সুভাষচন্দ্রের মত বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই মহান বিপ্লবী সাধকের প্রতি সাধারন সৌজন্য বোধেরও পরিচয় দেন নাই। আমরা আশা করিব এবার তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রান্ত চিন্তার সংশোধন

বই বইয়ের ঠিকানা

করিয়া লইয়া এই মহান বিপ্লবীর প্রতি নিজেদের দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিবেন।

২১।(২) সুভাষচন্দ্র গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী? কেহ কেহ দাবী করিয়া থাকেন সুভাষচন্দ্র নাকি গণতন্ত্রের পথে অর্থাৎ সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের কাজটি সম্পন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পদ্ধতিটি কি? গণতন্ত্রের কোন সুনির্দিষ্ট বা একার্থক সত্যকার রূপ নাই। যে যাঁহার খুসীমত গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তবে গণতন্ত্র আর একনায়কতন্ত্র এবং সাংবিধানিক পদ্ধতি ও বৈপ্লবীক পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী এটা সর্বজনস্বীকৃত-একথা আমরা সকলেই জানি। এখন দেখা যাক সুভাষচন্দ্র কোন গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পূজারী। সুভাষচন্দ্রের সব বক্তব্যই ছিল পরাধীন ভারতকে কেন্দ্র করিয়া, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার বক্তব্যটি বুঝিতে হইবে। সুভাষচন্দ্র বলেন "আমাদের প্রথম চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এটা হচ্ছে জাতীয় বিপ্লব। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি সামাজিক ব্যবস্থার পত্তন—এটা হচ্ছে সামাজিক বিপ্লব" (বিপ্লব কি, পৃ-১১)। "বিপ্লব দুই প্রকারের। এক হচ্ছে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব। দ্বিতীয় দেশের আভ্যন্তরীন সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব। বৈদেশিক শাসনাধীন দেশগুলিতে বিপ্লবের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় নূতন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি" (বিপ্লব কি, পৃ-৮)। বিপ্লব কাহাকে বলে? সুভাষচন্দ্র বলেন "যখন একটা বিপুল এবং মূলগত পরিবর্তন ঘটে, তখনই তাকে আমরা বিপ্লব বলে থাকি"। "বিপ্লবের পথে অস্ত্র ধারণ করে সমস্ত বাধা ধ্বংস করতে হয় এবং সেই জন্য রক্তপাত বিপ্লবের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়"। "বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তন আসে তা মূলগত। সামান্য দু'চারটি নগণ্য পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা চলে না। একটি গভর্নমেন্টের পরিবর্তন বা মন্ত্রীদলের পরিবর্তনকেও বিপ্লব বলা চলে না" (বিপ্লব কি, পৃ-৬)।

স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র তাঁহার মনোভাবটিকে আরও পরিস্কার ভাষায় তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন "তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজবাদী ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন সম্ভব নয়" (ফরোয়ার্ডব্লকে সুভাষবাদ ও মার্কসবাদ পৃ-৩৯)। তাহা হইলে কিভাবে এই অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজটি সফল করিয়া তুলিতে হইবে? সুভাষচন্দ্র বলেন "প্রাথমিক স্তরে সামরিক শৃঙ্খলায় ও একনায়কত্বে অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ জাতিকে উন্নত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাবে। সেই প্রাথমিক স্তর কেটে গেলে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হইলে, দ্বিতীয় পর্যায় জনসাধারণের হাতে অনেক ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে। ইংরেজ আমাদের মজ্জায় যে পাপগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে, একনায়কত্ব ব্যতীত দ্রুতগতিতে তা দূর করা যাবে না" (ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল)। অন্যত্র তিনি বলেন, "ভারতকে নিজের

পায়ে দাঁড়াবার জন্য কিছু দিন অন্তত একনায়কত্ব ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করতে হবে। অরাজকতা দমন করে ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখবার জন্য 'গণতন্ত্র নয়', চাই সামরিক নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা আবদ্ধ শক্তিশালী একদলীয় সরকার" (আনন্দবাজার, ২৩.১.৫২)। যাঁহারা সুভাষচন্দ্রকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পূজারী করিয়া তাঁহাকে নিজদলে টানিতে এবং নিজদের কাজ হাসিল করিতে চাহেন, আসা করিব এবার তাঁহরাও তাঁহাদের নিজ ভ্রান্ত ধারণাটি সংশোধন করিয়া লইতে দ্বিধা করিবেন না।

২৩।(৩) সুভাষচন্দ্র একজন জাতীয়তাবাদী? স্বাধীন ভারত গঠনে তাঁহার কোন পরিকল্পনা ছিল না? সমাজবাদ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বক্তব্য নাই? হাঁ, সুভাষচন্দ্র একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন নিশ্চয়ই এবং আজও তাহাই আছেন। এটা কিছু অগৌরবের কথা নয়। এটা সুভাষচন্দ্রের গৌরব, এটা আমাদের গৌরব, এটা সারা ভারতের গৌরব। সুভাষচন্দ্র তাঁহার জ্বলন্ত দেশপ্রেমের উজ্জ্বল আলোকে সারা ভরতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেন "আমি চিরকাল ভারতের সেবক থেকে আমার আটত্রিশ কোটি ভাই বোনের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করব। এই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। স্বাধীনতালাভের পরেও সেই স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে" (দিনের বাণী)। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা কি করিয়া ইহা বলিতে পারেন যে, স্বাধীন ভারত গঠনে সুভাষচন্দ্রের কোন পরিকল্পনা ছিল না এবং সমাজবাদ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বক্তব্য নেই। আমরা যতটা জানি গান্ধীজীকে বাদ দিলে, সুভাষচন্দ্রই সারা ভারতের প্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বাধীন ভারতকে কিভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহার একটা পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন (বিস্তারিত জানিতে হইলে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা বিষয়ক লেখাগুলি পড়িতে হইবে)। তবুও যাঁহারা বলেন স্বাধীন ভারতের জন্য সুভাষচন্দ্রের কোন পরিকল্পনা ছিল না, হয় তাঁহারা মিথ্যাবাদী, নতুবা তাঁহাদের রাজনৈতিক শৈশব আজও কাটে নাই। একথা নিশ্চয়েই তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই যে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তাঁহারই নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত গঠনের জন্য প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র যখন দেশ ত্যাগ করেন, তখন ভারত ছিল পরাধীন। পরাধীন ভারতে বসিয়া স্বাধীন ভারত গঠনের জন্য একটা পুর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব ছিল না। তবুও সুভাষচন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বাধীন ভারতকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, মোটামুটিভাবে তাহার একটা রূপ রেখা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনামত স্বাধীন ভারতের সমস্যা ও তাহার সমাধান কোন পথে এবার আমরা সেই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

বই বইয়ের ঠিকানা

২৩। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা মত স্বাধীন ভারতের সমস্যাগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১। দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, ২। দেশ রক্ষা ব্যবস্থা, ৩। বৈদেশিক বা পররাষ্ট্র নীতি। এই সম্বন্ধে আমরা সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব বক্তব্যগুলিই তুলিয়া ধরিব। ২৩। (১) দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ- (ক) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরের আর্থিক ও অন্যান্য সর্ববিধ অভাব-অভিযোগগুলি দূর করা, (খ) সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি জাতীয় অখণ্ডতা ও ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলির মোকাবিলা করিয়া জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা, (গ) ভাষা সমস্যার সমাধান।

(১-ক) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের আর্থিক ও অন্যান্য অভাব-অভিযোগগুলি কি ভাবে দূর করা যাবে। দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। দেশের আর্থিক পুনর্গঠন হইবে কোন পথে? সুভাষচন্দ্র বলেন "সমাজতন্ত্রের পথে। আর তা যে হবে এতে আমার কোন সন্দেহ নেই" (আনন্দবাজার, ২৩.১.৬৪ পৃ-১০)। "সমাজতন্ত্র অর্থব্যবস্থাকে ভেঙ্গে গড়বে, করবে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা। আর ঐহিক ভোগের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যক্তির সমান সুযোগের ব্যবস্থা" (আনন্দবাজার, ২৩.১.৫২) (সমাজতন্ত্র কি সে সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি)। সুভাষচন্দ্র তাঁহার এই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা কি ভাবে কার্যকরী করিতে হইবে, তাহার নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, "এর জন্য দরকার হবে জমি ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ। কৃষিঋণ বিলোপ ও সস্তা ঋণের ব্যবস্থা। সমবায় আন্দোলনের প্রসার এবং ফসল বারাবার জন্য বৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে শিল্পায়ন হবে অপরিহার্য"। "ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে। পণ্য উৎপাদন ও অর্থের বন্টন, দুই রাষ্ট্র করবে সমাজ হিতের জন্য। রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের"। "ব্যক্তির হাতে দারিদ্র ও বেকার সমস্যার সমাধান ছেড়েদিলে, শতশত বছরেও তার সমাধান হবে না" (আনন্দবাজার, ২৩.১.৫২)। এইভাবে সুভাষচন্দ্র সমাজবাদী অর্থনীতির ভিত্তিতে দেশের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরের অভাব অভিযোগগুলির সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন।

(১-খ) সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা বিরোধী শক্তিগুলির মোকাবিলা—ইংরেজের পোষ্য ধর্মীয় প্রাদেশিকতাবাদী ও অন্যান্য জাতীয়তা বিরোধী শক্তিগুলি স্বাধীন ভারতকে যে নানাভাবে উত্যক্ত করিতে পারে এই সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনে কোন সংশয় ছিল না। তবুও প্রাথমিক স্তরে তিনি নিরপেক্ষ মন লইয়া বিভিন্ন সাম্প্রদায়কে ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি বলেন, "স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন মনোভাব অবলম্বন করতে হবে এবং ধর্মাচরণের ব্যাপারে প্রত্যেককেই পূর্ণস্বাধীনতা প্রদান করতে হবে" (লোকসেবক, ২৩.১.৬৪)। কিন্তু তবুও যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন কি করিতে হইবে, সুভাষচন্দ্র বলেন "জাতির নামে তোলা বেড়াগুলির বিলোপ সাধন, সামাজিক বৈষম্য দূর করা এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ধ্বংস করতে হবে" (আনন্দবাজার ২৩.১.৬৪ পৃ-১০)। অন্যত্র তিনি বলেন, "সরকার কঠোর হস্তে অরাজকতা প্রভৃতি দমন করে স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করবে" (আনন্দবাজার, ২৩.১.৫২)। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে-'যাহা কিছু জাতীয় উন্নতির অন্তরায় তাহাকে নির্মম হস্তে নির্মূল করিয়া ফেলিতে হইবে'। এই ভাবেই সুভাষচন্দ্র ধর্মীয় ও অন্যান্য জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা বিরোধী শক্তিগুলিকে দমন করিয়া জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন।

(১-গ) ভাষা সমস্যা। স্বাধীন ভারত ভাষা সমস্যা লইয়াও একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে পারে বলিয়া সুভাষচন্দ্র মনে করিতেন। বিদেশী বৃটিশরাজ তাহাদের শাসন ও শোষন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য সারা ভারতে নিজ দেশীয় ভাষা ইংরেজির প্রবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কোন একটি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। স্বাধীন ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটা হইবে একটা বিরাট অন্তরায় এবং জাতীয় মর্যদাহানিকরও বটে। অথচ ভারতে প্রচলিত আছে বহু ভাষা এবং বিভিন্ন হরফ। সুভাষচন্দ্র চাহিয়াছিলেন ইহার একীকরণ। তিনি মনে করিতেন সারা ভারতের সর্বত্র সকল স্থানীয় ভাষাগুলি এবং রাষ্ট্রীয় ভাষার ক্ষেত্রে যদি একই হরফ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া আসিবে। তাই সুভাষচন্দ্র বলেন "দেশের সমস্ত স্থানে যদি আমরা রোমান (বা ল্যাটিন) হরফে লেখার বন্দোবস্ত করতে পারি, আমাদের সমস্যা তাহলে সমাধান হবে" (লোকসেবক, ২৩.১.৬৪)। ভাষার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র চাহিতেন আঞ্চলিক অর্থাৎ মাতৃভাষাই হইবে সর্বস্তরের শিক্ষার একমাত্র বাহন। কিন্তু ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ অর্থাৎ ঐক্য রক্ষা ও ভাববিনিমনেয়র ক্ষেত্রে তিনি একটা সর্বভারতীয় অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন। তাই রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে তিনি বলেন "হিন্দি ও উর্দুর সংমিশ্রণে আমরা হিন্দুস্থানী নামে একটি ভাষা রচনা করেছি" (২৩.১.৬০. আনন্দবাজার)। মনে হয় গান্ধীজী প্রবর্তিত রাষ্ট্র ভাষার কথাই হয়ত তিনি বলিয়াছেন। যাহাই হউক দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্র ভাষার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র হিন্দি বা ইংরেজী নয়, হিন্দি ও উর্দুভাষার সমন্বয়ে রচিত হিন্দুস্থানী ভাষাকেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করিতে চাহিয়াছিলেন। হয়ত একথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে গান্ধীজীও হিন্দুস্থানীকেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করিতে

বই বইয়ের ঠিকানা

চাহিয়াছিলেন। এক কথায় বলা চলে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে মাতৃভাষা, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী এবং সর্বক্ষেত্রে রোমান (বা ল্যাটিন) হরফের ব্যবহার, এইভাবেই সুভাষচন্দ্র ভারতের জটিল ভাষা ও হরফ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন।

২৩।(২) দেশ রক্ষা ব্যবস্থা। শতশত বছর বিদেশী শাসনে থাকার ফলে ভারতের কোন জাতীয় সেনা বাহিনী ছিল না। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন স্বাধীন ভারতে প্রথম দিকে অরাজকতা ও বিচ্ছিন্নতাকামী জাতীয় ঐক্য বিরোধী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে। স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীকে, অরাজকতা দমন ও জাতীয় ঐক্য বিরোধী শক্তিগুলির মোকাবিলা করিয়া আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা এবং বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে দেশ রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইতে হইবে। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক ভাল উচ্চপদস্থ ভারতীয় অফিসারের অভাবে স্বাধীন ভারতকে খুবই অসুবিধায় পড়িতে হইবে কারণ ইংরেজ আমলে ভারতীয়দের বেশী সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে খুব উঁচুতে উঠিতে দেওয়া হইত না। তাই স্বাধীন ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনী গড়ার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র একটি বিশেষ, সতর্কবানী জানাইয়াছিলেনষ তিনি বলেন, "উচ্চপদস্থ ভারতীয় অফিসারদের সংখ্যাল্পতা হেতু স্বাধীন ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনে একটি বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে। এই বিষয়ে ভারতের প্রধান সমস্যা হবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধরুন দশ বছরের মধ্যে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সর্ব স্তরের প্রচুর সংখ্যক অফিসার তৈরি করে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের কাজটি সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে" (আনন্দবাজার, ২৩.১.৬৪, পৃ-১০)। এইভাবে সুভাষচন্দ্র অতি অল্পসময়ের মধ্যে একটি অত্যাধুনিক সুষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করিয়া জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা এবং দেশ রক্ষার কাজটি সুনিশ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

২৩।(৩) বৈদেশিক অর্থাৎ পররাষ্ট্র নীতি। সুভাষচন্দ্র চাহিয়াছিলেন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি হইবে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ কিন্তু সক্রিয় ও বলিষ্ঠ। তিনি কখন অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলান বা ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুভাষচন্দ্র বলেন "আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ আমরা সহ্য করব না। নীতির কথা বিবেচনা করবেন না। অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথা চিন্তা করবেন না-তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই" (আনন্দবাজার, ১৫.৮.৭০, পৃ-ক)। "ভারতবর্ষ, পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের নীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু ভারতবর্ষ মস্কো বা ওয়াশিংটন কারো অন্ধ স্তাবক বা তাবেদার হবে না। ভারতবর্ষের নীতি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয়" (আনন্দবাজার, পৃ-..., ২৩.১.৭০)। সংক্ষেপে ইহাই হইল সুভাষচন্দ্রের বৈদেশিক অর্থাৎ পররাষ্ট্র নীতির মূল কথা।

আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনের বিশ্বাস ও কর্মপন্থা প্রভৃতি লইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে যে সব কথা প্রচলিত আছে সংক্ষেপে তাহার একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারত গঠনে সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও পরিকল্পনার বিষয়টিও তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা সুভাষচন্দ্রের নিজ উক্তির উদ্ধৃতির সাহায্যে মনে হয় একথা প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছি যে,ঃ- ১। সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী নন। ২। সুভাষচন্দ্র গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী নন। ৩। সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বাধীন ভারত গঠনেও তাহার একটা নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল এবং সমাজবাদ সম্বন্ধেও তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য আছে। তিনিও একজন সমাজবাদী চিন্তানায়ক, তবে তিনি চাহিয়াছিলেন সমাজবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের একটা সমন্বয় ঘটাইতে। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়াই জন্ম নিয়াছিল তাঁহার জীবনদর্শন-জাতীয় সমাজবাদী তত্ত্ব। অন্যান্য সমাজবাদীরা বিশেষভাবে মার্কসবাদীরা অর্থাৎ কমিউনিষ্টরা জাতীয় মনোভাবের কোন মূল্যই দিতে প্রস্তুত নয় বলিয়া সুভাষচন্দ্র মনে করিতেন। সুভাষচন্দ্র বলেন, 'কমিউনিজমের মূল ত্রুটি হলো এই যে, জাতীয় মনোভাবের মূল্য সে বোঝে না' (দিনের বাণী)। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জাতীয় ভিত্তির উপরেই সমাজবাদের প্রতিষ্টা দিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের চিন্তার আর একটি বৈশিষ্ট হইল এই যে, তিনি বিশ্বাস করিতেন, একটি শক্তিশালী একনায়কতন্ত্রী একদলীয় কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া তাঁহার সমাজবাদী পরিকল্পনা রূপায়নের কাজটি ত্বরান্বিত ও সফল করা সম্ভব নয়। অন্যান্য সমাজবাদীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সমাজবাদী চিন্তাধারার মৌলিক বিরোধ এইখানে। সুভাষচন্দ্রকে আমরা যেমন ভাবে বুঝিয়াছি, তাঁহার জীবন-দর্শনের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার যে নির্দেশ আমরা পাইয়াছি, স্বাধীন বাংলা তথা স্বাধীন ভারতের জনগণের দরবারে তাহাই সংক্ষেপে বিচারের জন্য উপস্থিত করিলাম।

এখন কর্তব্য স্থির করিতে হইবে জনগণকে পথ বাছিয়া লইতে হইবে, তরুণ বাংলা, তথা তরুন ভারতকে।

তৃতীয় অধ্যায়-শেষ।

তারাপ্রসাদ গুপ্ত

২৩.১.৭২

বই বইয়ের ঠিকানা

পরিশিষ্ট

জাতীয় ঘোষিত নীতির সঙ্গে, সুভাষচন্দ্রের নীতির মিল-অমিল।

১। আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা, যদি সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা মত স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমাদের বর্তমানের অনেক সমস্যাই দেখা দিত না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, স্বাধীন ভারত গঠনে সুভাষচন্দ্রের নীতি ও পরিকল্পনার সঙ্গে, আমাদের ঘোষিত জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনার কোন কোন ক্ষেত্রে অমিল থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট মিল আছে। মিল আছে, যেখানে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন,'সমাজবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পর-রাষ্ট্রনীতির কথা, আমাদের রাষ্ট্র নায়কেরাও সেখানে বলিতেছেন,-'সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কথা। অমিল দেখা যায় যেখানে সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন 'জাতীয়তাবাদের' কথা এবং সাময়িকভাবে হইলেও অন্তত কিছুদিনের জন্য একনায়কতন্ত্র ও একদলীয় শাষণের কথা। আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা সেখানে বলিতেছেন 'গণতন্ত্রের' কথা। আর জাতীয়তাবাদের কথা তাঁহারা ভুলেও কখনও উচ্চারণ করেন না। এখন আমরা একবার বিচার করিয়া দেখিতে চাই রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নীতি ও পরিকল্পনার যেখানে মিল আছে, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব সেখানে কার্যত কোন পথে চলিতেছেন এবং যেখানে মিল নেই, সেখানে কোন পথটি সঠিক, যুক্তিপূর্ণ এবং আমাদের পরিকল্পনার সফল রূপায়নের পথে সহায়ক হইবে। এই সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

২। যেখানে মিল আছে দেখিতে পাই, তাহার প্রথম প্রতিশ্রুতি-'সমাজতন্ত্র'। সুভাষচন্দ্র ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ উভয়েরই ঘোষিত নীতি হইল-'সমাজতন্ত্র'। উভয়েরই রহস্য একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই ব্যক্তি ও সমাজজীবনের অভাব অভিযোগগুলি দূর করিয়া সমাজে সামঞ্জস্য বিধান করাও একটা স্থায়িত্ব আনা সম্ভব। আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা আজ বিশ-পঁচিশ বছর ধরিয়া হামেসাই আমাদের সমাজবাদের কথা শুনাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা আজ পর্যন্ত যে সব কাজ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার সঙ্গে সমাজবাদের সম্পর্ক কোথায়? স্বাধীন ভারতের গত চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে এটা পরিস্কার বোঝা যায় যে আমাদের রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং ধনতন্ত্রের পথেই তাহার প্রসার ঘটিতেছে।

আমাদের রাষ্ট্র নেতারা মুখে যতই সমাজবাদের কথা বলুন না কেন, সমাজবাদের

প্রতি তাঁহাদের কোন আগ্রহ আছে বা দেশকে সমাজবাদের পথে একপাও আগাইয়া নিতে পারিয়াছেন এখন পর্যন্ত তাহার কোন পরিচয় আমরা পাই নাই। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের উচ্ছেদ কিছু কিছু ব্যাঙ্ক ও জীবন-বীমার রাষ্ট্রীয়করণ প্রভৃতি, সমাজবাদের পথে ভারতের অগ্রগতিরই পরিচয়। এই ধারণাটি কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। দেশীয় রাজ্যের উচ্ছেদের মূল রহস্য অন্যত্র নিহিত। প্রথমত ভারত বিভক্ত হওয়া ও পাকিস্তান সৃষ্টির পরে, অবশিষ্ট ভারতের স্বাধীনতা ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এক অভূতপূর্ব ও চমকপ্রদ কর্মতৎপরতায় এই পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে, ভারতভুক্ত করিয়া অবশিষ্ট ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে সুনিশ্চিত করেন। কিন্তু এটাই দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি করণের মূখ্য কারণ নয়। স্বাধীনতা লাভ ও ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ধনতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সামন্ত অর্থনীতি পরস্পর বিপরীত স্বার্থবিশিষ্ট। ধনতন্ত্রের বিকাশ ও প্রসারের পক্ষে, সামন্ত অর্থনীতি একটা প্রচণ্ড বাধা। সামন্তবাদের উচ্ছেদ না ঘটিলে ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। গোটা ভারতের প্রায় অর্ধাংশের মালিক ছিলেন এই পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের রাজা-মহারাজারা। তাঁহারা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন বা পৃথক সত্বা লইয়া দেশীয় রাজ্যরূপেই ভারতে অবস্থান করিতেন (সে অধিকার ভারতের স্বাধীনতা সনদে, দেশীয় রাজন্যবর্গের জন্য স্বীকৃত ছিল), তাহা হইলে প্রায় অর্ধেক ভারতের বিরাট বাজারটি ভারতীয় ধনবাদের আওতার বাহিরে থাকিত। কাজেই ভারতীয় ধনবাদের আত্মপ্রসার বা আত্মবস্তিারের প্রয়োজনেই এই দেশীয় রাজ্যগুলির উচ্ছেদ অপরিহার্য ছিল এবং হইয়াওছে তাহাই। দেশীয় রাজ্যগুলির উচ্ছেদের মূল রহস্য এইখানে নিহিত। তাহা হইলে কি দেশীয় রাজ্যের উচ্ছেদ কোন প্রগতিশীল ব্যবস্থা নয়? নিশ্চয়েই দেশীয় রাজ্যের উচ্ছেদ স্বাধীন ভারতের সমাজ বিকাশের পথে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ। কিন্তু এই ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কারনে নয়-ভারতীয় ধনবাদের আত্মবিস্তারের কারনে। অন্যাথায় এতগুলি দেশীয় রাজ্যের উচ্ছেদ ঘঠান হইল কিন্তু একটি ধনিক গোষ্ঠীরও গায় হাত পরিল না কেন? এই পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের মধ্যে গোটা কুড়ি-পঁচিশ রাজ্যকে বাদ দিলে, অন্যান্য সমস্ত রাজ্যগুলিকে কিনিয়া লইতে পারে, এমন একাধিক ধনিক গোষ্ঠী ভারতে বর্তমান। তবুও তাহাদের একটি সংস্থাকেও রাষ্ট্রীয়করণ করা হইল না কেন-বা হইতেছে না কেন? প্রায় অর্থেক ভারত জোড়া এই সব দেশীয় রাজ্যগুলি দখল করিয়া লওয়া হইয়াছে কোন ক্ষতিপুরণ না দিয়া কিছু কিছু বাৎসরিক ভাতার বিনিময়। আজ এই ভাতাদান প্রথার বিলোপ সাধনের দাবীও সোচ্চার। অথচ ধনিক গোষ্ঠী পরিচালিত কয়েকটি ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে যথেষ্ট

বই বইয়ের ঠিকানা

এমনকি অতিরিক্ত ক্ষতিপুরণের বিনিময়। কিন্তু কেন? কারণ ভারত প্রকৃতপক্ষে ভারতের ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত একটি ধনবাদী রাষ্ট্র-ইহার সঙ্গে সমাজবাদের কোন সম্বন্ধ নেই। সমাজবাদের মূল কথা হইল ধনসম্পদ এবং উৎপাদন ও বন্টন প্রভৃতি ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিমালিকানার অবসান এবং সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা। আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা যে সংবিধান রচনা করিয়াছেন এবং যে সংবিধানের বিধান মতে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে সেই সংবিধানে ধনসম্পদ এবং উৎপাদন ও বন্টন প্রভৃতি উপায়গুলির উপর ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তাহা ভোগ দখলের অধিকারও দিয়াছে। তাহা হইলে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে কি ভাবে? কাজেই এই সংবিধানের আওতায় সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা দেওয়া এবং ব্যক্তি ও সমাজজীবনের অভাব অভিযোগগুলি দুর করিয়া সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্রের অবসান ঘটান কোনটাই সম্ভব নয়। ইহার পরিচয় স্বাধীন ভারতের গত চব্বিশ বছরের ইতিহাসেই সেই আমরা পাইতেছি। অবশ্যি এই কথার মানে এই নয় যে আমরা তথাকথিত বামপন্থীসুলভ আক্ষেপে প্রলাপ বকিতে থাকিব যে গত চব্বিশ বছরে ভারতের কোন উন্নতি হয় নাই এবং বৃটিশ আমল হইতেও আমরা পিছাইয়া গিয়াছি। স্বাধীন ভারত, রাষ্ট্রগত ভাবে পৃথিবীর দেরশত রাষ্ট্রের মধ্যে গুটি কয়েক রাষ্ট্রকে বাদ দিলে অন্যান্য সকল রাষ্ট্র হইতে প্রায় সর্ব বিষয়েই উন্নত রাষ্ট্র এবং সর্বদিক হইতেই সে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভারত যেহেতু একটি ধনবাদী রাষ্ট্র এবং ধনবাদ যেহেতু চির সঙ্কটপূর্ণ তাই ধনবাদের সঙ্কট হইতেও সে কখনও মুক্ত থাকিতে পারে না। ভারত আগাইয়া চলিয়াছে-ধনবাদের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট লইয়াই সে আগাইয়া চলিয়াছে। সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ছাড়া ভারত কখন এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারে না—পারিবে না। পৃথিবীর কয়েকটি ধনবাদীরাষ্ট্র বিশেষভাবে আমেরিকা যুক্তরাজ্য যে কোন সমাজবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় রাষ্ট্রগতভাবে প্রায় সর্ববিষয়েই উন্নত এবং অগ্রগামী কিন্তু ধনতান্ত্রিক সঙ্কট সেখানেও বর্তমান এবং চারিদিক হইতে রাহুর মত তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতেছে। সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলি এই সঙ্কট হইতে মুক্ত। সেখানে ব্যক্তি-ব্যক্তিকে শোষণ করে না, গোষ্ঠী সমাজকে শোষণ করে না। সমাজবাদী সমাজ-শোষণ মুক্ত সমাজ। সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন, স্বাধীন ভারতকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী শোষণ মুক্ত একটি সমাজবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা। সুভাষচন্দ্র বলেন-"আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে ভারত তথা পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপর"। সমাজবাদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সুভাষচন্দ্র বলেন- "দরিদ্র ব্যাধি দূর করা তথা বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা করা একমাত্র সমাজবাদী উপায়েই সম্ভব। আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনায় দারিদ্র ও বেকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব যদি আমরা বেসরকারী ব্যক্তির উদ্যমের উপর ছেড়ে দেই, তাহলে

কয়েক শতাব্দীতেও এ সমস্যার সমাধান হবে না। .....বেসরকারী ব্যক্তির হাতে আর্থিক উন্নয়নের উদ্যম ছেড়ে দেওয়া হবে না - রাষ্ট্রকেই আর্থিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিতে হবে" (টোকিও বক্তৃতা, নেতাজীর বাণী, পৃ-৮)। আমাদের রাষ্ট্র ও সংবিধান ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—তাঁহারা কখন ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদের কথা বলেন না। সমাজবাদ ও ব্যক্তিমালিকানা - পরস্পর বিরোধী চিন্তা, সমাজবাদ ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না। আমাদের সংবিধান ও রাষ্ট্রনায়েকরা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করেন। তাহা হইলে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে কি ভাবে। ইতিপূর্বে আপনারা দেখিয়াছেন যে, সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করেন না। তিনি পরিস্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে ব্যক্তির হাতে আর্থিক উন্নয়নের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, রাষ্ট্রকেই আর্থিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিতে হইবে। কাজেই সমাজবাদ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদেরর মৌখিক মিল যতই থাক কার্যত কোন মিলই নেই। আজ একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের রাষ্ট্র নায়কদের গত চব্বিশ বছরের কার্যকলাপ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিপন্থী তাই আমাদের জনগণের দুঃখ-দরিদ্র ও অভাব অভিযোগগুলি দূর করারও পরিপন্থী। কাজেই সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের সফলতারও পরিপন্থী। আমরা আমাদের আলোচনাটি এইখানেই শেষ করিব।

তৃতীয় অধ্যায় শেষ।

লেখক ঃ- তারাপ্রসাদ গুপ্ত

২৩.১.৭২

বই বইয়ের ঠিকানা